ইন্দিরা

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণ হইতে]

ইন্দিরা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫২
মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
৬.০—২০।৬।১৯৪৫

ভূমিকা

'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী হইতে হইয়াছিল। সে যুগে লেখকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। 'বঙ্গদর্শনে'র মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের লেখক যেমন তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছে, সাময়িক-পত্রের উপযোগী বিভিন্ন ধরণের লেখার আদর্শও তাঁহাকে নিজেই গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। এই আদর্শ-প্রস্তুতের পরীক্ষায় বাংলা-সাহিত্য 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ সমালোচন', 'প্রবন্ধ-পুস্তক' প্রভৃতি বিচিত্র রচনাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। 'ইন্দিরা'ও 'বঙ্গদর্শনে'র বৈচিত্র্য-সম্পাদনে রচিত হইয়াছিল। ইহাকে বাংলা-সাহিত্যে ছোট গল্প রচনার পরীক্ষার প্রথম ফল বলা যাইতে পারে।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র-সংখ্যায় 'ইন্দিরা' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব-বৎসর পর্য্যন্ত ইহা ছোট-গল্প আকারেই প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দিরা' বৃদ্ধি পাইয়া উপন্যাসের আকার গ্রহণ করে। ইহাই 'ইন্দিরা'র পঞ্চম বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ। এই সংস্করণের পাঠই মূল পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

'ইন্দিরা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৫। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

ইন্দিরা। / উপন্যাস। / বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, / কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ১২৮০। / মূল্য চারি আনা মাত্র। /

প্রথম সংস্করণ ও পঞ্চম সংস্করণের পরিবর্ত্তন বুঝাইবার জন্য আমরা বর্ত্তমান সংস্করণের শেষে প্রথম সংস্করণ হুবহু পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। সুতরাং পাঠভেদ দেওয়া হয় নাই। 'ইন্দিরা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুস্তক আমরা দেখি নাই। অনুমান হয়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'উপকথা' পুস্তকে মুদ্রিত 'ইন্দিরা'কে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'উপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'ইন্দিরা'কে তৃতীয় সংস্করণ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই অনুমানের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

উপন্যাস' পুস্তকে 'ইন্দিরা'র ৪র্থ সংস্করণও (পৃ. ৪৫) যোজিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭৭।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন-অনূদিত *Indira and other Stories* প্রকাশিত হয়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে প্রকাশিত কানাড়ী ভাষায় 'ইন্দিরা'র অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ করেন— বি. বেঙ্কটাচার্য্য।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন

ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে। ইহা যদি কেহ অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছায় নিত্যই ছোট, বড় হইতেছে। রাজার কাজ ত এই দেখি, ছোটকে বড় করিয়া, বড়কে ছোট করেন। সমাজও দেখিতে পাই বড়কে ছোট, ছোটকে বড় করেন। আমিও যাহার অধীন, সে না হয়, আমাকে ছোট দেখিয়া, বড় করিল। তার আর কৈফিয়ৎ কি দিব ?

তবে দোষের কথাটা এই যে, বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কৃপায় বা সমাজের কৃপায় যাঁহারা বড় হয়েন, তাঁহারা বড় হইলেও আপনার আপনার দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি, পুলিসের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন, কেন না, বড় হইয়া তাঁহার দর বাড়িয়াছে। গরীব ইন্দিরা বলিতে পারে, আমি হঠাৎ বড় হইলাম, আমার কেন দর বাড়িবে না ?

তবে, ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে ? কিন্তু অনেক ছোট লোকেই তাহা স্বীকার করিবে না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে ?

পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবর বৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে, আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রন্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই !

Rarely, rarely, comest thou,
Spirit of Delight!
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night?
Many a weary night and day!
'Tis since thou art fled away.

How shall ever one like me
Win thee back again?
With the joyous and the free
Thou wilt scoff at pain.
Spirit false! Thou hast forgot
All but those who need thee not.

* * * *

Let me set my mournful ditty
To a merry measure;—
Thou wilt never come for pity,
Thou wilt come for pleasure.

* * * *

Thou art love and life! O come!
Make once more my heart thy home!

Shelley.

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না; বলিলেন, "বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?" শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। রাগে আমার শরীর গর গর করিত। কত টাকা চাই? পিতা মাতার উপর বড় রাগ হইত—কেন পোড়া টাকা উপার্জ্জনের কথা তাঁহারা তুলিয়াছিলেন? টাকা কি আমার সুখের চেয়ে বড়! আমার বাপের ঘরে অনেক টাকা—আমি টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলিতাম। মনে মনে করিতাম, একদিন টাকা পাতিয়া শুইয়া দেখিব—কি সুখ? একদিন মাকে বলিলাম, "মা, টাকা পাতিয়া শুইব।" মা বলিলেন, "পাগলী কোথাকার!" মা কথাটা বুঝিলেন। কি কল কৌশল করিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট্ বটে ত?) কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন, হাল আইনে তাঁহাকে "আমার উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারি জন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম। বলিলাম, "আমার প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল ; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।"

আমার ছোট বহিন কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল ;—বলিল, "দিদি! আবার আসিবে কবে?" আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম।

কামিনী বলিল, "দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস না?"

আমি বলিলাম, 'জানি। সে নন্দন-বন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র উঠে।"

কামিনী হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম

ভগিনীর এই আশীর্ব্বাদ লইয়া আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুর-বাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে, জানিতাম।

তাই চক্ষে একটু একটু জল আসিয়াছিল। রাত্রিতে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইব না, তিনি কেমন। রাত্রিতে ত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন না, আমি কেমন। মা বহু যত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—দশ ক্রোশ পথ যাইতে যাইতে খোঁপা খসিয়া যাইবে, চুল সব স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। পাল্কীর ভিতর ঘামিয়া বিশ্রী হইয়া যাইব। তৃষ্ণায়

মুখের তাম্বূলরাগ শুকাইয়া উঠিবে, শ্রান্তিতে শরীর হতশ্রী হইয়া যাইবে। তোমরা হাসিতেছ? আমার মাথার দিব্য হাসিও না, আমি ভরা যৌবনে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। পাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই জন্য লোকে "ডাকাতে কালা দীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা কিছু জল-টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায়, কেবল ঠাকুর দেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌঁছি—কোথায়, বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল! কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামিসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্ ভরা যৌবনে!

এই ভাবিতে ভাবিতে আমি ক্ষণেক পরে, অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাৎ গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারি পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত "পাহাড়,"—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী;

পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা! কি সুন্দর শ্বেত মেঘের স্তর-পরম্পরের মূর্ত্তিবৈচিত্র্য—কিবা নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষী সকলের নীলিমামধ্যে বিকীর্ণ কৃষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা! মনে মনে হইল, এমন কোন বিদ্যা নাই কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌঁছিতাম!

আবার সরোবর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম—এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম যে, বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুরবাড়ীর, একজন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য! ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপ চারি জন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে! কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে? পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পলাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া

যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, যেখানে নামাইল, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নইলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণ ভাবে বলিল, "বাছা, অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরৎ হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

একজন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না।—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দ্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়িতে এইখানেই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ

এমনও কি কখনও হয় ? এত বিপদ্, এত দুঃখ কাহারও কখনও ঘটিয়াছে ? কোথায় প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম—সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার পরিয়া, কত সাধে চুল বাঁধিয়া, সাধের সাজা পানে অকলুষিত ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া, সুগন্ধে এই কৌমারপ্রফুল্ল দেহ আমোদিত করিয়া এই উনিশ বৎসর লইয়া, প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম, কি বলিয়া এই অমূল্য রত্ন তাঁহার পাদপদ্মে উপহার দিব, তাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম ;—অকস্মাৎ তাহাতে এ কি বজ্রাঘাত ! সর্ব্বালঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে,—লউক ; জীর্ণ মলিন দুর্গন্ধ বস্ত্র পরাইয়াছে,—পরাক্ ; বাঘ-ভালুকের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে,—যাক্ ; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে,—তা যাক্—প্রাণ আর চাহি না এখন গেলেই ভাল ; কিন্তু যদি প্রাণ না যায়, যদি বাঁচি, তবে কোথায় যাইব ? আর ত তাঁকে দেখা হইল না—বাপ মাকেও বুঝি দেখিতে পাইব না ! কাঁদিলে ত কান্না ফুরায় না।

তাই কাঁদিব না বলিয়া স্থির করিতেছিলাম। চক্ষুর জল কিছুতেই থামিতেছিল না, তবু চেষ্টা করিতেছিলাম—এমন সময়ে দূরে কি একটা বিকট গর্জ্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া, রক্ত শুষিয়া খাইবে, ভাবিলাম, তাও সহ্য করিব ; শরীরের কষ্ট বৈ ত না। মরিতে পাইব, সেই পরম সুখ। অতএব কান্না বন্ধ করিয়া, একটু প্রফুল্ল হইয়া, স্থিরভাবে রহিলাম, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাতার যত বার ঘস্ ঘস্ শব্দ হয়, তত বার মনে করি, ঐ সর্ব্বদুঃখহর প্রাণস্নিগ্ধকর বাঘ আসিতেছে। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম। তখন মনে হইল—যেখানে বড় ঝোপ জঙ্গল, সেইখানে সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতরে কত বেড়াইলাম। হায় ! মনুষ্য দেখিলে সকলেই পলায়—বনমধ্যে কত সর্ সর্ ঝট্ পট্ শব্দ শুনিলাম, কিন্তু সাপের ঘাড়ে ত পা পড়িল না ; আমার পায়ে অনেক কাঁটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কৈ ? সাপে ত কামড়াইল না। আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়াছিলাম—আর বেড়াইতে পারিলাম না। একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়া বসিলাম। সহসা সম্মুখে এক ভল্লুক উপস্থিত হইল—মনে করিলাম, ভালুকের হাতেই মরিব। ভালুকটাকে তাড়া করিয়া মারিতে গেলাম। কিন্তু হায় !

ভালুকটা আমায় কিছু বলিল না। সে গিয়া এক বৃক্ষের উপর উঠিল। বৃক্ষের উপর হইতে কিছু পরে ঝন্ করিয়া সহস্র মক্ষিকার শব্দ হইল। বুঝিলাম, এই বৃক্ষে মৌচাক আছে, ভালুক জানিত; মধু লুটিবার লোভে আমাকে ত্যাগ করিল।

শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিল—বসিয়া বসিয়া গাছে হেলান দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন যাই কোথায়?

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে। আলোতে প্রথমেই দেখিলাম, আমার হাতে কিছু নাই, দস্যুরা প্রকোষ্ঠালঙ্কার সকল কাড়িয়া লইয়া বিধবা সাজাইয়াছে। বাঁ হাতে এক টুকরা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিলাম।

তার পর চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম যে, আমি যেখানে বসিয়া ছিলাম, তাহার নিকট অনেকগুলি গাছের ডাল কাটা; কোন গাছ সমূলে ছিন্ন, কেবল শিকড় পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, এখানে কাঠুরিয়ারা আসিয়া থাকে। তবে গ্রামে যাইবার পথ আছে। দিবার আলোক দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—আবার আশার উদয় হইয়াছিল;—উনিশ বৎসর বৈ ত বয়স নয়! সন্ধান করিতে করিতে একটা অতি অস্পষ্ট পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। তাই ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল। ভরসা হইল গ্রাম পাইব।

তখন আর এক বিপদ্ মনে হইল—গ্রামে যাওয়া হইবে না। যে ছেঁড়া মুড়া কাপড়টুকু ডাকাইতেরা আমাকে পরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন মতে কোমর হইতে আঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে—আমার বুকে কাপড় নাই। কেমন করিয়া লোকালয়ে কালামুখ দেখাইব? যাওয়া হইবে না—এইখানে মরিতে হইবে। ইহাই স্থির করিলাম।

কিন্তু পৃথিবীকে রবিরশ্মিপ্রভাসিত দেখিয়া, পক্ষিগণের কলকূজন শুনিয়া, লতায় লতায় পুষ্পরাশি দুলিতে দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তখন গাছ হইতে কতকগুলা পাতা ছিঁড়িয়া ছোটা দিয়া গাঁথিয়া, তাহা কোমরে ও গলায় ছোটা দিয়া বাঁধিলাম। এক রকম লজ্জা নিবারণ হইল, কিন্তু পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তখন সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে গরুর ডাক শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, গ্রাম নিকট।

কিন্তু আর ত চলিতে পারি না। কখনও চলা অভ্যাস নাই। তার পর সমস্ত রাত্রি জাগরণ, রাত্রির সেই অসহ্য মানসিক ও শারীরিক কষ্ট; ক্ষুধা তৃষ্ণা। আমি অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলাম। শুইবা মাত্র নিদ্রাভিভূত হইলাম।

নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম যে, মেঘের উপর বসিয়া ইন্দ্রালয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছি। স্বয়ং রতিপতি যেন আমার স্বামী—রতিদেবী আমার সপত্নী—পারিজাত লইয়া তাহার সঙ্গে কোন্দল করিতেছি। এমন সময়ে কাহারও স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, একজন যুবা পুরুষ, দেখিয়া বোধ হইল, ইতর অন্ত্যজ জাতীয়, কুলী মজুরের মত, আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে একখানা কাঠ সেখানে পড়িয়াছিল। তাহা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া সেই পাপিষ্ঠের মাথায় মারিলাম। কোথায় জোর পাইলাম জানি না, সে ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

কাঠখানা আর ফেলিলাম না; তাহার উপর ভর করিয়া চলিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একটা গাই তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহেশপুর কোথায়? মনোহরপুরই বা কোথায়? প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা! তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া গাইটি দুইয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ, বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে এক দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে?"

আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি ?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ ! ঐ রূপ, রূপ শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। এই দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাজক, পৌরোহিত্য করেন। আমার বস্ত্রের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন ? তোমার কাপড় কি কেহ কাড়িয়া লইয়াছে ?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" তিনি যজমানদিগের নিকট অনেক কাপড় পাইতেন—দুইখানা খাটো বহরের চৌড়া রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী আমাকে পরিতে দিলেন। শাঁকার কড়ও তাঁর ঘরে ছিল, তাহাও চাহিয়া লইয়া পরিলাম।

এ সকল কার্য্য সমাধা করিলাম—অতি কষ্টে। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী দুটি ভাত দিলেন—খাইলাম। একটা মাদুর দিলেন, পাতিয়া শুইলাম। কিন্তু এত কষ্টেও ঘুমাইলাম না। আমি যে জন্মের মত গিয়াছি—আমার যে মরাই ভাল ছিল, কেবল তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। ঘুম হইল না।

প্রভাতে একটু ঘুম আসিল। আবার একটা স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে অন্ধকারময় যমমূর্ত্তি, বিকট দংষ্ট্রারাশি প্রকটিত করিয়া হাসিতেছে। আর ঘুমাইলাম না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গা বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গায়ের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্রসন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

এক দিন শুনিলাম যে, ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয় আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবু আমার যজমান। সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা, বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথা আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।" কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে, বসু মহাশয়ের পরিবার কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও, কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন, চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পরদিন নৌকায় উঠিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাজিয়ে যাব মল

আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্ত্ত জন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়! তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌকা; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ি মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কত রকমের লোক, কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকত ভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয় দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।

যে দিন কলিকাতায় পৌঁছিব, তাহার পূর্ব্বদিন, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জোয়ার আসিল। নৌকা আর গেল না। একখানা ভদ্র গ্রামের একটা বাঁধা ঘাটের নিকট আমাদের নৌকা

লাগাইয়া রাখিল। কত সুন্দর জিনিস দেখিলাম ; জেলেরা মোচার খোলার মত ডিঙ্গীতে মাছ ধরিতেছে, দেখিলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘাটের রাণায় বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন, দেখিলাম। কত সুন্দরী, বেশভূষা করিয়া জল লইতে আসিল। কেহ জল ফেলে, কেহ কলসী পুরে, কেহ আবার ঢালে, আবার পুরে, আর হাসে, গল্প করে, আবার ফেলে, আবার কলসী ভরে। দেখিয়া আমার প্রাচীন গীতটি মনে পড়িল,

একা কাঁকে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায় !
কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়।

সেই দিন সেইখানে দুইটি মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কখন ভুলিব না। মেয়ে দুইটির বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল। কানে দুল, হাতে আর গলায় এক একখানা গহনা। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ্ করা, শিউলীফুলে ছোবান, দুইখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারি গাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটি কলসী আছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে গায়িতে নামিল। গানটি মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল, তাই এখানে লিখিলাম। এক জন এক এক পদ গায়, আর এক জন দ্বিতীয় পদ গায়। তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা। প্রথমে গায়িল,—

অমলা

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নির্ম্মলা

ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

অমলা

বিনোদ বেশে মুচ্‌কে হেসে,
খুলব হাসির কল।

কলসী ধ'রে, গরব ক'রে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

নির্ম্মলা

গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

অমলা

যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফিরচে দলে দল।
কত বুড়ী, জুজুবুড়ী
ধরবে কত জল,
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল,
সই বাজিয়ে যাব মল ॥

দুই জনে

আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল।

বালিকাসিঞ্চিতরসে, এ জীবন কিছু শীতল হইল। আমি মনোযোগপূর্ব্বক এই গান শুনিতেছি, দেখিয়া বসুজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছাই গান আবার হাঁ করিয়া শুনচ কেন?" আমি বলিলাম, "ক্ষতি কি?"

বসুজপত্নী। ছুঁড়ীদের মরণ আর কি? মল বাজানর আবার গান!

আমি। ষোল বছরের মেয়ের মুখে ভাল শুনাইত না বটে, সাত বছরের মেয়ের মুখে বেশ শুনায়। জোয়ান মিন্‌ষের হাতের চড় চাপড় জিনিস ভাল নহে বটে, কিন্তু তিন বছরের ছেলের হাতের চড় চাপড় বড় মিষ্ট।

বসুজপত্নী আর কিছু না বলিয়া, ভারি হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এ প্রভেদ কেন হয়? এক জিনিস দুই রকম লাগে কেন? যে দান দরিদ্রকে দিলে পুণ্য হয়, তাহা বড়মানুষকে দিলে খোষামোদ বলিয়া গণ্য হয় কেন? যে সত্য ধর্ম্মের প্রধান, অবস্থাবিশেষ তাহা আত্মশ্লাঘা বা পরনিন্দা পাপ হয় কেন? যে ক্ষমা পরমধর্ম্ম, দুষ্কৃতকারীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে, তাহা মহাপাপ কেন? সত্য সত্যই কেহ স্ত্রীকে বনে দিয়া আসিলে লোকে তাহাকে মহাপাপী বলে; কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে বনে দিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ মহাপাপী বলে না কেন?

ঠিক করিলাম, অবস্থাভেদে এ সকল হয়। কথাটা আমার মনে রহিল। আমি ইহার পর এক দিন যে নির্লজ্জ কাজের কথা বলিব, তাহা এই কথা মনে করিয়া করিয়াছিলাম। তাই এ গানটা এখানে লিখিলাম।

নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া, বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র;—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞান বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য, অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে?* নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্ত্তী রাজপথে গাড়ি পাল্কী পিপড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই। তখন মনে হইল, ইহার ভিতর খুড়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে? নদীসৈকতের বালুকারাশির ভিতর হইতে, চেনা বালুকাকণাটি খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবো

কৃষ্ণদাস বাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা?"

* কলিকাতায় এক্ষণে নৌকার সংখ্যা পূর্ব্বকার শতাংশও নাই।

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না—আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। এক জন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় এক জন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে ?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর। আজ সুবী আসিবার কথা আছে, তাকে বলিয়া দিব, বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখিবে।"

আমি শুনিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। "শেষ কি কপালে দাসীপনা ছিল!" আমার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। কৃষ্ণদাস বাবুর দয়া হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি কি করিব ?" সে কথা সত্য ;—তিনি কি করিবেন ? আমার কপাল !

আমি একটা ঘরের ভিতর গিয়া একটা কোণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস বাবুর গিন্নী আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, "এই সুবো এয়েছে। তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, তবে বলিয়া দিই।"

ঝি থাকিব না, না খাইয়া মরিব, সে কথা ত স্থির করিয়াছি ;—কিন্তু এখনকার সে কথা নহে—এখন একবার সুবোকে দেখিয়া লইলাম। "সুবো" শুনিয়া আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে "সাহেব সুবো" দরের একটা কি জিনিস—আমি তখন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। দেখিলাম, তা নয়—একটি স্ত্রীলোক—দেখিবার মত সামগ্রী। অনেক দিন এমন ভাল সামগ্রী কিছু দেখি নাই। মানুষটি আমারই বয়সী হইবে। রঙ্ আমা অপেক্ষা যে ফরসা তাও নয়। বেশভূষা এমন কিছু নয়, কানে গোটাকতক মাকড়ি, হাতে বালা, গলায় চীক, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরা। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—চারি দিক্ হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখন হাসিতেছে। ঠোঁট দুইখানি পাতলা রাঙ্গা টুকটুকে ফুলের পাপড়ির মত উল্টান, মুখখানি ছোট, সবশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল। গড়ন পিটন কি রকম, তাহা ধরিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, সেই রকম তাহার সর্ব্বাঙ্গ খেলিতে লাগিল—যেমন নদীতে ঢেউ খেলে, তাহার শরীরে

তেমনই কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু ধরিতে পারিলাম না, তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল। পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না যে, আমি পুরুষ মানুষ নহি—মেয়ে মানুষ—নিজেও এক দিন একটু সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা ছিলাম। সুবোর সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে—সেটিও তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।

আমি অনিমেষলোচনে সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি দেখিয়া, কৃষ্ণদাস বাবুর গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কথার উত্তর দাও না যে—ভাব কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে ?"

গৃহিণী ঠাকুরাণী ধমকাইয়া বলিলেন, "তাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? ও সুবো, আর কে ?"

তখন সুবো একটু হাসিয়া বলিল, "তা মাসীমা, একটু বলিয়া দিতে হয় বৈ কি ? উনি নূতন লোক, আমায় ত চেনেন না।" এই বলিয়া সুবো আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম সুভাষিণী গো—ইনি আমার মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।"

তার পর কথার সূত্রটা গৃহিণী নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "কলিকাতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। তারা বড় মানুষ। ছেলেবেলা থেকে ও শ্বশুরবাড়ীই থাকে—আমরা কখন দেখিতে পাই না। আমি কালীঘাটে এসেছি শুনে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে। ওরা বড় মানুষ। বড় মানুষের বাড়ী তুমি কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে ত ?"

আমি হরমোহন দত্তের মেয়ে, টাকার গদিতে শুইতে চাহিয়াছিলাম—আমি বড় মানুষের বাড়ী কাজ করিতে পারিব ত ? আমার চোখে জলও আসিল ; মুখে হাসিও আসিল।

তাহা আর কেহ দেখিল না—সুভাষিণী দেখিল। গৃহিণীকে বলিল, "আমি একটু আড়ালে সে সকল কথা ওঁকে বলি গে। যদি উনি রাজি হন, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল না। কেবল ছেলেটি মার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া গেল। একখানা তক্তপোষ পাতা ছিল। সুভাষিণী তাহাতে বসিল—আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল, "আমার নাম না জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। তোমার নাম কি ভাই ?"

"ভাই !" যদি দাসীপনা করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি, মনে মনে ইহা ভাবিয়াই উত্তর করিলাম, "আমার দুইটি নাম—একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত। যেটি

অপ্রচলিত, তাহাই ইঁহাদিগকে বলিয়াছি ; কাজেই আপনার কাছে এখন তাহাই বলিব। আমার নাম কুমুদিনী।”

ছেলে বলিল, “কুনুডিনী।”

সুভাষিণী বলিল, “আর নাম এখন নাই শুনিলাম, জাতি কায়স্থ বটে ?”

হাসিয়া বলিলাম, “আমরা কায়স্থ।”

সুভাষিণী বলিল, “কার মেয়ে, কার বউ, কোথায় বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব, তাহা শুন। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি—তোমার হাতে গলায়, গহনার কালি আজিও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে বলিব না—তুমি কিছু কিছু রাঁধিতে জান না কি ?”

আমি বলিলাম, “জানি। রান্নায় আমি পিত্রালয়ে যশস্বিনী ছিলাম।”

সুভাষিণী বলিল, “আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। (মাঝখান থেকে ছেলে বলিল, “মা, আমি দাঁদি”) তবু, কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে। সে মাগীটা বাড়ী যাইবে। (ছেলে বলিল, “ত মা বালী দাই”) এখন মাকে বলিয়া তোমাকে তার জায়গায় রাখাইয়া দিব। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তারই সঙ্গে তুমি দুই এক দিন রাঁধিবে। কেমন রাজি ?”

ছেলে বলিল, “আজি ? ও আজি ?”

মা বলিল, “তুই পাজি।”

ছেলে বলিল, “আমি বাবু, বাবা পাজি।”

“অমন কথা বলতে নেই বাবা !” এই কথা ছেলেকে বলিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া হাসিয়া সুভাষিণী বলিল, “নিত্যই বলে।” আমি বলিলাম, “আপনার কাছে আমি দাসীপনা করিতেও রাজি।”

আপনি কেন বল ভাই ? বল ত মাকে বলিও। সেই মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনি একটু খিট্‌খিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে। তা তুমি পারিবে—আমি মানুষ চিনি। কেমন রাজি ?”

আমি বলিলাম, “রাজি না হইয়া কি করি ? আমার আর উপায় নাই।” আমার চক্ষুতে আবার জল আসিল।

সে বলিল, “উপায় নাই কেন ? রও ভাই, আমি আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আসিতেছি।”

সুভাষিণী ভোঁ করিয়া ছুটিয়া মাসীর কাছে গেল—বলিল, “হাঁ গা, ইনি তোমাদের কে গা ?”

ঐটুকু পর্য্যন্ত আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর মাসী কি বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। বোধ হয়, তিনি যতটুকু জানিতেন, তাহাই বলিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি কিছুই জানিতেন না ; পুরোহিতের কাছে যতটুকু শুনিয়াছিলেন, ততটুকু পর্য্যন্ত। ছেলেটি এবার মার সঙ্গে যায় নাই—আমার হাত লইয়া খেলা করিতেছিল। আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। সুভাষিণী ফিরিয়া আসিল।

ছেলে বলিল, "মা, আঙ্গা হাত দেখ্।"

সুভাষিণী হাসিয়া বলিল, "আমি তা অনেকক্ষণ দেখিয়াছি।" আমাকে বলিল, "চল গাড়ি তৈয়ার। না যাও, আমি ধরিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু যে কথাটা বলিয়াছি—মাকে বশ করিতে হইবে।"

সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাড়িতে তুলিল। পুরোহিত মহাশয়ের দেওয়া রাঙ্গাপেড়ে কাপড় দুইখানির মধ্যে একখানি আমি পরিয়াছিলাম—আর একখানি দড়িতে শুকাইতেছিল—তাহা লইয়া যাইতে সময় দিল না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি সুভাষিণীর পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে চলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালির বোতল

মা—সুভাষিণীর শাশুড়ী। তাঁহাকে বশ করিতে হইবে—সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম, তার পর এক নজর দেখিয়া লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে, একটা পাটী পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালি ভরা, পাটীর উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি বোতলটির টিনের ঢাকনির* মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?"

বধূ বলিল, "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়া এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে ?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন না কায়েৎ ?

ব। কায়েৎ।

* Capsule.

গৃ। আঃ, তোমার মাসীমার পোড়া কপাল! কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? এক দিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয় দিন চলে চলুক—তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন! কেন, আমরা কি মুচি?

আমি মনে মনে সুভাষিণীকে ভূয়সী প্রশংসা করিলাম—কালিভরা লম্বা বোতলটাকে সে মুঠোর ভিতর আনিতে জানে দেখিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বটে মা—ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিন কতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে?"

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায় রে, কলিকালের মেয়ে! লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই?

আমাকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তুমি?"

আমি বলিলাম, "যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এয়েছি, তখন যা দিবেন তাই নিব।"

গৃ। তা বামনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে—তোমায় তিন টাকা মাসে আর খোরাক পোষাক দিব।

আমার একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট—সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, মাহিয়ানা লইতে হইবে শুনিয়াই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তাই দিবেন।"

মনে করিলাম, গোল মিটিল—কিন্তু তাহা নহে। লম্বা বোতলটায় কালি অনেক। তিনি বলিলেন, "তোমার বয়স কি গা? অন্ধকারে বয়স ঠাওর পাইতেছি না—কিন্তু গলাটা ছেলেমানুষের মত বোধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "বয়স এই উনিশ কুড়ি।"

গৃহিণী। তবে বাছা, অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ গিয়া যাও। আমি সমত্ত লোক রাখি না।

সুভাষিণী মাঝে হইতে বলিল, "কেন মা, সমত্ত লোকে কি কাজ কর্ম্ম পারে না?"

গৃ। দূর বেটী পাগলের মেয়ে। সমত্ত লোক কি লোক ভাল হয়?

সু। সে কি মা! দেশশুদ্ধ সব সমত্ত লোক কি মন্দ?

গৃ। তা নাই হলো—তবে ছোট লোক যারা খেটে খায় তারা কি ভাল?

এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুঁড়ী চললো না কি?"

সুভাষিণী বলিল, "বোধ হয়।"

গৃ। তা যাক গে।

সু। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার পিছু পিছু উঠিয়া আসিল। আমাকে ধরিয়া আপনার শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর আমায় ধরিয়া রাখিতেছ কেন? পেটের দায়ে, কি প্রাণের দায়ে, আমি এমন সব কথা শুনিবার জন্য থাকিতে পারিব না।"

সুভাষিণী বলিল, "থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমার অনুরোধে আজিকার রাত্রিটা থাক।"

কোথায় যাইব? কাজেই চক্ষু মুছিয়া সে রাত্রিটা থাকিতে সম্মত হইলাম। এ কথা ও কথার পর সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যদি না থাক, তবে যাবে কোথায়?"

আমি বলিলাম, "গঙ্গায়।"

এবার সুভাষিণীও একটু চক্ষু মুছিল। বলিল, "গঙ্গায় যাইতে হইবে না, আমি কি করি তা একটুখানি বসিয়া দেখ। গোলযোগ উপস্থিত করিও না—আমার কথা শুনিও।"

এই বলিয়া সুভাষিণী হারাণী বলিয়া ঝিকে ডাকিল। হারাণী সুভাষিণীর খাস্ ঝি। হারাণী আসিল। মোটা সোটা, কালো কুচ্‌কুচে, চাল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল-তাতেই হাসি। একটু তিরবিরে। সুভাষিণী বলিল, "একবার তাঁকে ডেকে পাঠা।"

হারাণী বলিল, "এখন অসময়ে আসিবেন কি? আমি ডাকিয়া পাঠাই বা কি করিয়া?"

সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গ করিল, "যেমন করে পারিস্—ডাক গে যা।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি সুভাষিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাকিতে পাঠাইলে কাকে? তোমার স্বামীকে?"

সু। না ত কি পাড়ার মুদি মিন্‌ষেকে এই রাত্রে ডাকিতে পাঠাইব?

আমি বলিলাম, "বলি, আমায় উঠিয়া যাইতে হইবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

সুভাষিণী বলিল, "না। এইখানে বসিয়া থাক।"

সুভাষিণীর স্বামী আসিলেন। বেশ সুন্দর পুরুষ। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "তলব কেন?" তার পর আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইনি কে?"

সুভাষিণী বলিল, "ওঁর জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আমাদের রাঁধুনী বাড়ী যাবে, তাই ওঁকে তার জায়গায় রাখিবার জন্য আমি মাসীর কাছ হইতে এনেছি। কিন্তু মা ওঁকে রাখিতে চান না।"

তাঁর স্বামী বলিলেন, "কেন চান না ?"

সু। সমত্ত বয়স।

সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা আমায় কি করিতে হইবে ?"

সু। ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

স্বামী। কেন ?

সুভাষিণী, তাঁহার নিকট গিয়া, আমি না শুনিতে পাই, এমন স্বরে বলিলেন, "আমার হুকুম।"

কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর স্বামীও তেমনই স্বরে বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

সুভা। কখন পারিবে ?

স্বামী। খাওয়ার সময়।

তিনি গেলে আমি বলিলাম, "উনি যেন রাখাইলেন, কিন্তু এমন কটূ কথা সয়ে আমি থাকি কি প্রকারে ?"

সুভাষিণী। সে পরের কথা পরে হবে। গঙ্গা ত আর এক দিনে বুজিয়ে যাইবে না।

রাত্রি নয়টার সময়, সুভাষিণীর স্বামী (তাঁর নাম রমণ বাবু) আহার করিতে আসিলেন। তাঁর মা কাছে গিয়া বসিল। সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল, "কি হয় দেখি গে চল।"

আমরা আড়াল হইতে দেখিলাম, নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে, কিন্তু রমণ বাবু একবার একটু করিয়া মুখে দিলেন, আর সরাইয়া রাখিলেন। কিছুই খাইলেন না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই ত খেলি না বাবা !"

পুত্র বলিল, "ও রান্না ভূত প্রেতে খেতে পারে না। বামন ঠাকুরাণীর রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে গেছে। মনে করেছি কাল থেকে পিসীমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব।"

তখন গৃহিণী ছোট হয়ে গেলেন। বলিলেন, "তা করতে হবে না যাদু ! আমি আর রাঁধুনী আনাইতেছি।"

বাবু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন। দেখিয়া সুভাষিণী বলিল, "আমাদের জন্য ভাই ওঁর খাওয়া হইল না। তা না হোক—কাজটা হইলে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কি বলিতেছিলাম, এমন সময়ে হারাণী আসিয়া সুভাষিণীকে

বলিল, "তোমার শাশুড়ী ডাকিতেছেন।" এই বলিয়া সে খানখা আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, হাসি তার রোগ, সুভাষিণী শাশুড়ীর কাছে গেল, আমি আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম।

সুভাষিণীর শাশুড়ী বলিতে লাগিল, "সে কায়েৎ ছুঁড়ীটে চ'লে গেছে কি?"

সুভা। না—তার এখনও খাওয়া হয় নাই বলিয়া, যাইতে দিই নাই।

গৃহিণী বলিলেন, "সে রাঁধে কেমন?"

সুভা। তা জানি না।

গৃ। আজ না হয় সে নাই গেল। কাল তাকে দিয়া দুই একখানা রাঁধিয়ে দেখিতে হইবে।

সুভা। তবে তাকে রাখি গে।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি রাঁধিতে জান ত?"

আমি বলিলাম, "জানি। তা ত বলেছি।"

সুভা। ভাল রাঁধিতে পার ত?

আমি। কাল খেয়ে দেখে বুঝিতে পারিবে।

সুভা। যদি অভ্যাস না থাকে তবে বল, আমি কাছে বসিয়া শিখিয়ে দিব।

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "পরের কথা পরে হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবি পাণ্ডব

পরদিন রাঁধিলাম। সুভাষিণী দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়া সেই সময়ে লঙ্কা ফোড়ন দিলাম—সে কাশিতে কাশিতে উঠিয়া গেল, বলিল, "মরণ আর কি!"

রান্না হইলে, বালকবালিকারা প্রথমে খাইল। সুভাষিণীর ছেলে অন্ন ব্যঞ্জন বড় খায় না, কিন্তু সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে ছিল। সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?"

সে বলিল, "বেশ! বেশ গো বেশ?" মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত, সে আবার বলিল, "বেশ গো বেশ,

রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ,

বকুল ফুলের মালা।

রাঙ্গা সাড়ী, হাতে হাঁড়ী,
রাঁধছে গোয়ালার বালা ॥
এমন সময়, বাজল বাঁশী,
কদম্বের তলে।
কাঁদিয়ে ছেলে, রান্না ফেলে,
রাঁধুনি ছোটে জলে ॥"

মা ধমকাইল, "নে শ্লোক রাখ্।" তখন মেয়ে চুপ করিল।

তার পর রমণ বাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন। গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। রমণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রেঁধেছে মা ?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটি নূতন লোক আসিয়াছে।"

রমণ বাবু বলিলেন, "রাঁধে ভাল।" এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন।

তার পর কর্ত্তা খাইতে বসিলেন। সেখানে আমি যাইতে পারিলাম না—গৃহিণীর আদেশমত বুড়া বামন ঠাকুরাণী কর্ত্তার ভাত লইয়া গেলেন। এখন বুঝিলাম, গৃহিণীর কোথায় ব্যথা, কেন তিনি সমর্থবয়স্কা স্ত্রীলোক রাখিতে পারেন না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, যত দিন এখানে থাকি, সে দিক্ মাড়াইব না।

আমি সময়ান্তরে লোকজনের কাছে সংবাদ লইয়াছিলাম, কর্ত্তার কেমন চরিত্র। সকলেই জানিত, তিনি অতি ভদ্র লোক—জিতেন্দ্রিয়। তবে কালির বোতলটার গলায় গলায় কালি।

বামন ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কর্ত্তা রান্না খেয়ে কি বললেন ?"

বামনী চটিয়া লাল ; চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "ও গো, বেশ রেঁধেছ গো, বেশ রেঁধেছ। আমরাও রাঁধিতে জানি ; তা বুড়ো হলে কি আর দর হয় ! এখন রাঁধিতে গেলে রূপ যৌবন চাই।"

বুঝিলাম, কর্ত্তা খাইয়া ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু বামনীকে নিয়া একটু রঙ্গ করিতে সাধ হইল। বলিলাম, "তা রূপ যৌবন চাই বই কি বামন দিদি !—বুড়ীকে দেখিলে কার খেতে রোচে ?"

দাঁত বাহির করিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে বামনী বলিল, "তোমারই বুঝি রূপ যৌবন থাকিবে ? মুখে পোকা পড়বে না ?"

এই বলিয়া রাগের মাথায় একটা হাঁড়ি চড়াইতে গিয়া পাচিকা দেবী হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিলে দিদি ! রূপযৌবন না থাকিলে হাতের হাঁড়ি ফাটে।"

তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় বেড়ী নিয়া আমাকে তাড়া করিয়া মারিতে আসিলেন। বয়োদোষে কাণে একটু খাট, বোধ হয় আমার সকল কথা শুনিতে পান নাই। বড় কদর্য্য প্রত্যুত্তর করিলেন। আমারও রঙ্গ চড়িল। আমি বলিলাম, "দিদি, থামো। বেড়ী হাতে থাকিলেই ভাল।"

এই সময়ে সুভাষিণী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামনী রাগে তাহাকে দেখিতে পাইল না। আমাকে আবার তাড়াইয়া আসিয়া বলিল, "হারামজাদী! যা মুখে আসে তাই বলিবি! বেড়ী আমার হাতে থাকিবে না ত কি পায়ে দেবে নাকি? আমি পাগল!"

তখন সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গ করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদী বলবার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

তখন পাচিকা শশব্যস্তে বেড়ী ফেলিয়া দিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "ও মা সে কি কথা গো! আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম! এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি নে। তোমরা আশ্চর্য্য করিলে মা!"

শুনিয়া সুভাষিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বামন ঠাকুরাণী তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—বলিলেন, "আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে আমি যেন গোল্লায় যাই—"

(আমি বলিলাম, "বালাই! ষাট্!")

"আমি যেন যমের বাড়ী যাই—"

(আমি। সে কি দিদি; এত সকাল সকাল! ছি দিদি! আর দুদিন থাক না।)

"আমার যেন নরকেও ঠাঁই হয় না—"

এবার আমি বলিলাম, "ওটি বলিও না, দিদি! নরকের লোক যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক আবার কি?"

বুড়ী কাঁদিয়া সুভাষিণীর কাছে নালিশ করিল, "আমাকে যা মুখে আসিবে, তাই বলিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না? আমি চল্লেম গিন্নীর কাছে।"

সুভা। বাছা, তা হলে আমাকেও বলিতে হইবে, তুমি এঁকে হারামজাদী বলেছ।

বুড়ী তখন গালে চড়াইতে আরম্ভ করিল, "আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম! (এক ঘা)—আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম!! (দুই ঘা)—আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম!!! (তিন ঘা) ইতি সমাপ্ত।

তখন আমরা বুড়ীকে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে আমি বলিলাম, "হাঁ গা বৌ ঠাকুরাণ—হারামজাদী বলতে তুমি কখন্ শুনিলে? উনি কখন্ এ কথা বললেন? কই আমি ত শুনি নাই।"

বুড়ী তখন বলিল, "এই শুনিলে বৌ দিদি ! আমার মুখে কি অমন সব কথা বেরোয় !"

সুভাষিণী বলিল, "তা হবে—বাহিরে কে কাকে বলিতেছিল, সেই কথাটা আমার কাণে গিয়া থাকিবে। বামুন ঠাকুরাণী কি তেমন লোক ! ওঁর রান্না কাল খেয়েছিলে ত ? এ কলিকাতার ভিতর অমন কেউ রাঁধিতে পারে না।"

বামনী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনলে গা ?"

আমি বলিলাম, "তা ত সবাই বলে। আমি অমন রান্না কখনও খাই নাই।"

বুড়ী এক গাল হাসিয়া বলিল, "তা তোমরা বলবে বৈ কি মা! তোমরা হলে ভাল মানুষের মেয়ে, তোমরা ত রান্না চেন। আহা! এমন মেয়েকে কি আমি গালি দিতে পারি—এ কোন বড় ঘরের মেয়ে। তা তুমি দিদি ভেবো না, আমি তোমাকে রান্না বান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

বুড়ীর সঙ্গে এইরূপে আপোষ হইয়া গেল। আমি অনেক দিন ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম। অনেক দিনের পর আজ হাসিলাম। সে হাসি তামাসা দরিদ্রের নিধির মত. বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। তাই বুড়ীর কথাটা এত সবিস্তারে লিখিলাম। সেই:হাসি আমি এ জন্মে ভুলিব না। আর কখন হাসিয়া তেমন সুখ পাইব না।

তার পর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসিয়া থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যঞ্জনগুলি খাওয়াইলাম। মাগী গিলিল অনেক। শেষ বলিল, "রাঁধ ভাল ত গা! কোথায় রান্না শিখিলে ?"

আমি বলিলাম, "বাপের বাড়ী।"

গৃহি। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা ?

আমি একটা মিছে কথা বলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "এ ত বড় মানুষের ঘরের মত রান্না। তোমার বাপ কি বড় মানুষ ছিলেন ?"

আমি। তা ছিলেন।

গৃহি। তবে তুমি রাঁধিতে এসেছ কেন?

আমি। দুরবস্থায় পড়িয়াছি।

গৃহি। তা আমার কাছে থাক, বেশ থাকিবে। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে।

পরে সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌ মা, দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি ত বলবেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।"

সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়াছিল। ছেলে বলিল, "আমি কলা কতা বলব।"

আমি বলিলাম, "বল দেখি !"

সে বলিল, "কলা চাতু (চাটু) হাঁলি—আল্ কি মা ?"

সুভাষিণী বলিল, "আর তোর শাশুড়ী।"

ছেলে বলিল, "কৈ ছাছুলী ?"

সুভাষিণীর মেয়ে আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ তোর শাশুড়ী।"

তখন ছেলে বলিতে লাগিল, "কুনুডিনী ছাছুলী! কুনুডিনী ছাছুলী।"

সুভাষিণী আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য বেড়াইতেছিল। ছেলে মেয়ের মুখের এই কথা শুনিয়া সে আমাকে বলিল, "তবে আজ হইতে তুমি আমার বেহাইন হইলে।"

তার পর সুভাষিণী খাইতে বসিল। আমি তারও কাছে খাওয়াইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কয়টি বিয়ে, বেহান ?"

কথাটা বুঝিলাম। বলিলাম, "কেন, রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগিল না কি ?"

সুভা। ও ইয়াস্! বিবি পাণ্ডব ফাষ্ট কেলাস বাবর্চি ছিল। এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে ত ?

আমি বলিলাম, "বড় নয়। কাঙ্গালের আর বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।"

সুভাষিণী হাসিয়া উঠিল। বলিল, "মরণ আর কি তোমার! এই বুঝি বুঝিয়াছ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব'লে বুঝি তোমার আদর করেছেন ?"

আমি বলিলাম, "তবে কি ?"

সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভরে খাবে, তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি একটু কোট কর, তবে তোমার মাইনা ডবল হইয়া যায়।

আমি বলিলাম, "আমি মাহিনা চাই না। না লইলে যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এজন্য হাত পাতিয়া মাহিয়ানা লইব। লইয়া তোমার নিকট রাখিব, তুমি কাঙ্গাল গরীবকে দিও। আমি আশ্রয় পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

নবম পরিচ্ছেদ

পাকাচুলের সুখ দুঃখ

আমি আশ্রয় পাইলাম। আর একটি অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটি হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে, সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভালবাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত। তাঁর শাসনে দাসদাসীরাও আমাকে অমান্য করিত না। এদিকে রান্নাবান্না সম্বন্ধেও

সুখ হইল। সেই বুড়ী ব্রাহ্মণঠাকুরাণী,—তাহার নাম সোণার মা,—তিনি বাড়ী গেলেন না। মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাকরিটি পাইবেন না, আমি কায়েমী হইব। তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করিয়া বাড়ী গেলেন না। সুভাষিণীর সুপারিসে আমরা দুই জনেই রহিলাম। তিনি শাশুড়ীকে বুঝাইলেন যে, কুমুদিনী ভদ্রলোকের মেয়ে, একা সব রান্না পারিয়া উঠিবে না—আর সোণার মা বুড় মানুষই বা কোথায় যায়? শাশুড়ী বলিল, "দুই জনকেই কি রাখিতে পারি? এত টাকা যোগায় কে?"

বধূ বলিল, "তা এক জনকে রাখিতে হলে সোণার মাকে রাখিতে হয়। কুমু এত পারবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "না না। সোণার মার রান্না আমার ছেলে খেতে পারে না। তবে দুই জনেই থাক্।"

আমার কষ্টনিবারণ জন্য সুভাষিণী এই কৌশলটুকু করিল। গিন্নী তার হাতে কলের পুতুল; কেন না, সে রমণের বৌ—রমণের বৌর কথা ঠেলে কার সাধ্য? তাতে আবার সুভাষিণীর বুদ্ধি যেমন প্রখরা, স্বভাবও তেমনই সুন্দর। এমন বন্ধু পাইয়া, আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।

আমি মাছ মাংস রাঁধি, বা দুই একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি—বাকি সময়টুকু সুভাষিণীর সঙ্গে গল্প করি—তার ছেলে মেয়ের সঙ্গে গল্প করি; হলো বা স্বয়ং গৃহিণীর সঙ্গে একটু ইয়ারকি করি। কিন্তু শেষ কাজটায় একটা বড় গোলে পড়িয়া গেলাম। গৃহিণীর বিশ্বাস তাঁর বয়স কাঁচা, কেবল অদৃষ্টদোষে গাছকতক চুল পাকিয়াছে, তাহা তুলিয়া দিলেই তিনি আবার যুবতী হইতে পারেন। এই জন্য তিনি লোক পাইলেই এবং অবসর পাইলেই পাকা চুল তুলাইতে বসিতেন। এক দিন আমাকে এই কাজে বেগার ধরিলেন। আমি কিছু ক্ষিপ্রহস্ত, শীঘ্র শীঘ্রই ভাদ্র মাসের উলু ক্ষেত সাফ করিতেছিলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সুভাষিণী আমাকে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে ডাকিল। আমি গৃহিণীর কাছ হইতে ছুটি লইয়া বধূর কাছে গেলাম। সুভাষিণী বলিল, "ও কি কাণ্ড! আমার শাশুড়ীকে নেড়া মুড়া করিয়া দিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "ও পাপ একদিনে চুকানই ভাল।"

সুভা। তা হলে কি টেঁকতে পারবে? যাবে কোথায়?

আমি। আমার হাত থামে না যে।

সুভা। মরণ আর কি! দুই একগাছি তুলে চলে আসতে পার না!

আমি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। বল গে যে, কই, পাকা চুল ত বেশী দেখিতে পাই না—এই ব'লে চ'লে এসো।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন দিনেডাকাতি কি করা যায়? লোকে বলবে কি? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি।"

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি?

সুভাষিণীর সঙ্গে কথা কহিতে আমি একটু আত্মবিস্মৃত হইতাম—হঠাৎ কালাদীঘির কথা অসাবধানে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিলাম, "সে গল্প আর একদিন করিব।"

সুভা। আমি যা বলিলাম, তা একবার বলিয়াই দেখ না? আমার অনুরোধে।

হাসিতে হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গিয়া আবার পাকা চুল তুলিতে বসিলাম। দুই চারি গাছা তুলিয়া বলিলাম, "কৈ আর বড় পাকা দেখিতে পাই না। দুই এক গাছা রহিল, কাল তুলে দিব।"

মাগী এক গাল হাসিল। বলিল, "আবার বেটীরা বলে সব চুলই পাকা।"

সে দিন আমার আদর বাড়িল। কিন্তু যাহাতে দিন দিন বসিয়া বসিয়া পাকা চুল তুলিতে না হয়, সে ব্যবস্থা করিব মনে মনে স্থির করিলাম। বেতনের টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে একটা টাকা হারাণীর হাতে দিলাম। বলিলাম, "একটা টাকার এক শিশি কলপ কারও হাত দিয়া কিনিয়া আনিয়া দে।" হারাণী হাসিয়া কুটপাট। হাসি থামিলে বলিল, "কলপ নিয়ে কি করবে গা? কার চুলে দেবে?"

আমি। বামন ঠাকুরাণীর।

এবার হারাণী হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। এমন সময়ে বামন ঠাকুরাণী সেখানে আসিয়া পড়িল। তখন সে, হাসি থামাইবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল। বামন ঠাকুরাণী বলিলেন, "ও অত হাসিতেছে কেন?"

আমি বলিলাম, "ওর অন্য কাজ ত দেখি না। এখন আমি বলিয়াছিলাম যে, বামন ঠাকুরাণীর চুলে কলপ দিয়া দিলে হয় না? তাই অমন করছিল।"

বামন ঠা। তা অত হাসি কিসের? দিলেই বা ক্ষতি কি? শোণের নুড়ি শোণের নুড়ি ব'লে ছেলেগুলা খেপায়, তা সে দায়ে ত বাঁচব!"

সুভাষিণীর মেয়ে হেমা অমনই আরম্ভ করিল,

চলে বুড়ী, শোণের নুড়ী,
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি, গলায় দড়ী,
কাণে জোড়া দুল।

হেমার ভাই বলিল, "জোলা হুম্ !" তখন কাহারও উপর জোলা হুম্ পড়িবে আশঙ্কায় সুভাষিণী তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল।

বুঝিলাম, বামনীর কলপে বড় ইচ্ছা। বলিলাম, "আচ্ছা, আমি কলপ দিয়া দিব।"

বামনী বলিল, "আচ্ছা, তাই দিও। তুমি বেঁচে থাক, তোমার সোনার গহনা হোক। তুমি খুব রাঁধতে শেখ।"

হারাণী হাসে, কিন্তু কাজের লোক। শীঘ্র এক শিশি উত্তম কলপ আনিয়া দিল। আমি তাহা হাতে করিয়া গিন্নীর পাকা চুল তুলিতে গেলাম। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে কি ও?"

আমি বলিলাম, "একটা আরক। এটা চুলে মাখাইলে সব পাকা চুল উঠিয়া আসে, কাঁচা চুল থাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "বটে, এমন আশ্চর্য্য আরক ত কখন শুনি নাই। ভাল, মাখাও দেখি। দেখিও কলপ দিও না যেন।"

আমি উত্তম করিয়া তাঁহার চুলে কলপ মাখাইয়া দিলাম। দিয়া, "পাকা চুল আর নাই," বলিয়া চলিয়া গেলাম। নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সমস্ত চুলগুলি কাল হইয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হারাণী ঘরঝাঁট দিতে দিতে তাহা দেখিতে পাইল। তখন সে ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে সদর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে "কি ঝি? কি ঝি?" এই রকম একটা গোলযোগ হইলে, সে আবার ভিতর বাড়ীতে আসিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে ছাদের উপর চলিয়া গেল। সেখানে সোনার মা চুল শুকাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" হারাণী হাসির জ্বালায় কথা কহিতে পারিল না; কেবল হাত দিয়া মাথা দেখাইতে লাগিল। সোনার মা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, নীচে আসিয়া দেখিল যে, গৃহিণীর মাথার চুল সব কালো—সে ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ও মা! এ কি হলো গো! তোমার মাথার সব চুল কালো হয়ে গেছে গো! ওমা কে না জানি তোমায় ওষুধ করিল!"

এমন সময় সুভাষিণী আসিয়া আমাকে পাকড়াইল—হাসিতে হাসিতে বলিল, "পোড়ারমুখী, ও করেছ কি, মার চুলে কলপ দিয়াছ?"

আমি। হুঁ!

সুভা। তোমার মুখে আগুন! কি কাণ্ডখানা হয় দেখ!

আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এমন সময়ে গৃহিণী স্বয়ং আমাকে তলব করিলেন। বলিলেন, "হাঁ গা কুমো! তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ?"

দেখিলাম, গৃহিণীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। আমি বলিলাম, "অমন কথা কে বল্লে মা!"

গৃ। এই যে সোনার মা বলছে!

আমি। সোনার মার কি? ও কলপ নয় মা, আমার ওষুধ।

গৃ। তা বেশ ওষুধ বাছা। আরসি একখানা আন দেখি।

একখানা আরসি আনিয়া দিলাম। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, সব চুল কালো হয়ে গেছে! আঃ, আবাগের বেটী, লোকে এখনই বলবে কলপ দিয়েছে।"

গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। সে দিন সন্ধ্যার পর আমার রান্নার সুখ্যাতি করিয়া আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন। আর বলিলেন, "বাছা! কেবল কাচের চুরি হাতে দিয়া বেড়াও, দেখিয়া কষ্ট হয়।" এই বলিয়া তিনি নিজের বহুকালপরিত্যক্ত এক জোড়া সোনার বালা আমায় বখশিস করিলেন। লইতে, আমার মাথা কাটা গেল—চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না। কাজেই "লইব না" কথাটা বলিবার অবসর পাইলাম না।

একটু অবসর পাইয়া বুড়া বামন ঠাকুরাণী আমাকে ধরিল। বলিল, "ভাই, আর সে ওষুধ নেই কি?"

আমি। কোন্ ওষুধ? বামনীকে তার স্বামী বশ করবার জন্যে যা দিয়েছিলেম?

বামনী। দূর হ! একেই বলে ছেলে বুদ্ধি। আমার কি সে সামগ্রী আছে?

আমি। নেই? সে কি গো? একটাও না?

বামনী। তোদের বুঝি পাঁচটা করে থাকে?

আমি। তা নইলে আর অমন রাঁধি? দ্রৌপদী না হ'লে ভাল রাঁধা যায়! গোটা পাঁচেক যোটাও না, রান্না খেয়ে লোকে অজ্ঞান হবে।

বামনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, "একটাই যোটে না ভাই—তার আবার পাঁচটা! মুসলমানের হয়, যত দোষ হিন্দুর মেয়ের। আর হবেই বা কিসে? এই ত শোণের নুড়ী চুল! তাই বলছিলাম, বলি সে ওষুধটা আর আছে, যাতে চুল কালো হয়?"

আমি। তাই বল! আছে বৈ কি।

আমি তখন কলপের শিশি বামন ঠাকুরাণীকে দিয়া গেলাম। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী, রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়নকালে, অন্ধকারে, তাহা চুলে মাখাইয়াছিলেন; কতক চুলে লাগিয়াছিল, কতক চুলে লাগে নাই, কতক বা মুখে চোখে লাগিয়াছিল। সকাল বেলা যখন তিনি দর্শন দিলেন, তখন চুলগুলা পাঁচরঙ্গা বেড়ালের লোমের মত, কিছু সাদা, কিছু রাঙ্গা, কিছু কালো; আর মুখখানি কতক মুখপোড়া বাঁদরের মত, কতক মেনি বেড়ালের মত। দেখিবা মাত্র পৌরবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। যে যখন পাচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া উঠে। হারাণী হাসিতে হাসিতে বেদম হইয়া

সুভাষিণীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বৌঠাকুরাণী আমাকে জবাব দাও, আমি এমন হাসির বাড়ীতে থাকিতে পারিব না—কোন্ দিন দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব।"

সুভাষিণীর মেয়েও বুড়ীকে জ্বালাইল, বলিল, "বুড়ী পিসী—সাজ সাজালে কে ?

যম বলেছে, সোনার চাঁদ
এস আমার ঘরে।
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।"

একদিন একটা বিড়াল হাঁড়ি হইতে মাছ খাইয়াছিল, তাহার মুখে কালি ঝুলি লাগিয়াছিল। সুভাষিণীর ছেলে তাহা দেখিয়াছিল। সে বুড়ীকে দেখিয়া বলিল, "মা! বুলী পিচী হাঁলি কেয়েসে।"

অথচ বামন ঠাকুরাণীর কাছে, আমার ইঙ্গিতমত, কথাটা কেহ ভাঙ্গিল না। তিনি অকাতরে সেই বানরমার্জ্জারবিমিশ্র কান্তি সকলের সম্মুখে বিকশিত করিতে লাগিলেন। হাসি দেখিয়া তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা কেন হাসচ গা ?"

সকলেই আমার ইঙ্গিতমত বলিল, "ঐ ছেলে কি বলচে শুনচো না ? বলে, বুলী পিচী হাঁলি কেয়েসে। কাল রাতে কে তোমার হাঁড়িশালে হাঁড়ি খেয়ে গিয়েছে, তাই সবাই বলাবলি করচে, বলি সোনার মা কি বুড়া বয়সে এমন কাজ করবে ?"

বুড়ী তখন গালির ছড়া আরম্ভ করিল—"সর্ব্বনাশীরা! শতেকক্ষোয়ারীরা! আবাগীরা!" —ইত্যাদি ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের স্বামী পুত্রকে গ্রহণ করিবার জন্য যমকে অনেক বার তিনি আমন্ত্রণ করিলেন—কিন্তু যমরাজ সে বিষয়ে আপাততঃ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ঠাকুরাণীর চেহারাখানা সেই রকম রহিল। তিনি সেই অবস্থায় রমণ বাবুকে অন্ন দিতে গেলেন। রমণ বাবু দেখিয়া হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইলেন, আর তাঁহার খাওয়া হইল না। শুনিলাম, রামরাম দত্তকে অন্ন দিতে গেলে, কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

শেষ দয়া করিয়া সুভাষিণী বুড়ীকে বলিয়া দিল, "আমার ঘরে বড় আয়না আছে। মুখ দেখ গিয়া।"

বুড়ী গিয়া মুখ দেখিল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং আমাকে গালি পাড়িতে লাগিল। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমি চুলে মাখাইতে বলিয়াছিলাম, মুখে মাখাইতে বলি নাই। বুড়ী তাহা বুঝিল না। আমার মুণ্ডভোজনের জন্য যম পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। শুনিয়া সুভাষিণীর মেয়ে শ্লোক পড়িল—

"যে ডাকে যমে।
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই।
বুড়ী মরে যা না ভাই।"

শেষে আমার সেই তিন বৎসর বয়সের জামাতা, একখানা রাঁধিবার চেলা কাঠ লইয়া গিয়া বুড়ীর পিঠে বসাইয়া দিল। বলিল, "আমাল্ চাচুলী।" তখন বুড়ী আছাড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে যত কাঁদে, আমার জামাই তত হাততালি দিয়া নাচে, আর বলে, "আমাল্ চাচুলী, আমাল্ চাচুলী!" আমি গিয়া তাকে কোলে নিয়া, তার মুখচুম্বন করিলে তবে থামিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আশার প্রদীপ

সেই দিন বৈকালে সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া নিভৃতে বসাইল। বলিল, "বেহান! তুমি সেই কালাদীঘির ডাকাতির গল্পটি বলিবে বলিয়াছিলে—আজিও বল নাই। আজ বল না—শুনি।"

আমি অনেকক্ষণ ভাবিলাম। শেষ বলিলাম, "সে আমারই হতভাগ্যের কথা। আমার বাপ বড় মানুষ, এ কথা বলিয়াছি। তোমার শ্বশুরও বড় মানুষ—কিন্তু তাঁহার তুলনায় কিছুই নহেন। আমার বাপ আজিও আছেন—তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এখনও আছে, আজিও তাঁহার হাতীশালে হাতী বাঁধা। আমি যে রাঁধিয়া খাইতেছি, কালাদীঘির ডাকাতিই তাহার কারণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুই জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। সুভাষিণী বলিল, "তোমার যদি বলিতে কষ্ট হয়, তবে নাই বলিলে। আমি না জানিয়াই শুনিতে চাহিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সমস্তই বলিব। তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে বলিতে কোন কষ্ট নাই।"

আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম বলিলাম না। শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না। আর সমস্ত বলিলাম, সুভাষিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্ত বলিলাম। শুনিতে শুনিতে সুভাষিণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও যে বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন সুভাষিণী আমাকে আবার নিভৃতে লইয়া গেল। বলিল, "বাপের নাম বলিতে হইবে।"

তাহা বলিলাম।

"তাঁর বাড়ী যে গ্রামে, তাহাও বলিতে হইবে।"

তাও বলিলাম।

সু। ডাকঘরের নাম বল।

আ। ডাকঘর! ডাকঘরের নাম ডাকঘর।

সু। দূর পোড়ারমুখী! যে গ্রামে ডাকঘর, তার নাম।

আমি। তা ত জানি না। ডাকঘরই জানি।

সু। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকঘর আছে, না অন্য গ্রামে?

আমি। তা ত জানি না।

সুভাষিণী বিষণ্ণ হইল। আর কিছু বলিল না। পরদিন সেইরূপ নিভৃতে বলিল, "তুমি বড় ঘরের মেয়ে, কত কাল আর রাঁধিয়া খাইবে? তুমি গেলে আমি বড় কাঁদিব—কিন্তু আমার সুখের জন্য তোমার সুখের ক্ষতি করি, এমন পাপিষ্ঠা আমি নই। তাই আমরা পরামর্শ করিয়াছি—"

কথা শেষ না হইতে হইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কে কে?"

সু। আমি আর র-বাবু।

র-বাবু কি না রমণ বাবু। এইরূপে সুভাষিণী আমার কাছে স্বামীর নাম ধরিত। তখন সে বলিতে লাগিল, "পরামর্শ করিয়াছি যে, তোমার বাপকে পত্র লিখিব যে, তুমি এইখানে আছ, তাই কাল ডাকঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

আমি। তবে সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছ?

সু। বলিয়াছি—দোষ কি?

আমি। দোষ কিছু না। তার পর?

সু। এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে, বিবেচনা করিয়া পত্র লেখা হইল।

আমি। পত্র লেখা হইয়াছে না কি?

সু। হাঁ।

আমি আহ্লাদে আটখানা হইলাম। দিন গণিতে লাগিলাম, কত দিনে পত্রের উত্তর আসিবে। কিন্তু কোন উত্তর অসিল না। আমার কপাল পোড়া—মহেশপুরে কোন ডাকঘর ছিল না। তখন গ্রামে গ্রামে ডাকঘর হয় নাই। ভিন্ন গ্রামে ডাকঘর ছিল—আমি রাজার দুলালী—অত খবর রাখিতাম না। ডাকঘরের ঠিকানা না পাইয়া, কলিকাতার বড় ডাকঘরে রমণ বাবুর চিঠি খুলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল।

আমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু র-বাবু—নাছোড়। সুভাষিণী আসিয়া আমাকে বলিল, "এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে।"

আমি তখন লিখিতে শিখিয়াছিলাম। স্বামীর নাম লিখিয়া দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা হইল, "শ্বশুরের নাম?"

তাও লিখিলাম।

"গ্রামের নাম?"

তাও বলিয়া দিলাম।

"ডাকঘরের নাম?"

বলিলাম, "তা কি জানি?"

শুনিলাম, রমণ বাবু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বড় বিষণ্ণ হইলাম। কিন্তু একটা কথা তখন মনে পড়িল, আমি আশায় বিহ্বল হইয়া পত্র লিখিতে বারণ করি নাই। এখন আমার মনে পড়িল, ডাকাতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; আমার কি জাতি আছে? এই ভাবিয়া, শ্বশুর স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন সন্দেহ নাই। সে স্থলে, পত্র লেখা ভাল হয় নাই। এ কথা শুনিয়া সুভাষিণী চুপ করিয়া রহিল।

আমি এখন বুঝিলাম যে, আমার আর ভরসা নাই। আমি শয্যা লইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটা চোরা চাহনি

এক দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, কিছু ঘটার আয়োজন। রমণ বাবু উকীল। তাঁহার একজন বড় মোয়াক্কেল ছিল। দুই দিন ধরিয়া শুনিতেছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। রমণ বাবু ও তাঁহার পিতা সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সহিত কারবার-ঘটিত কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজ শুনিলাম, তাঁহাকে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাই পাকশাকের কিছু বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রান্না ভাল চাই—অতএব পাকের ভারটা আমার উপর পড়িল। যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। রামরাম বাবু, রমণ বাবু, ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলেন। পরিবেশনের ভার বুড়ীর উপর—আমি বাহিরের লোককে কখন পরিবেশন করি না।

বুড়ী পরিবেশন করিতেছে—আমি রান্নাঘরে আছি—এমন সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রমণ বাবু বুড়ীকে বড় ধমকাইতেছিলেন। সেই সময়ে এক জন রান্নাঘরের ঝি আসিয়া বলিল, "ইচ্ছে ক'রে লোককে অপ্রতিভ করা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে ?"

ঝি বলিল, "বুড়ী দাদা বাবুর বাটিতে (বুড়া ঝি, দাদাবাবু বলিত)—বাটিতে ডাল দিতেছিল—তিনি তা দেখেও উহু! উহু! ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলেন—সব ডাল হাতে পড়িয়া গেল।"

আমি এদিকে শুনিতেছিলাম, রমণ বাবু বামনীকে ধমকাইতেছেন, "পরিবেশন করতে জান না ত এসো কেন ? আর কাকেও থাল দিতে পার নি ?"

রামরাম বাবু বলিলেন, "তোমার কর্ম্ম নয়! কুমোকে পাঠাইয়া দাও গিয়া।"

গৃহিণী সেখানে নাই, বারণ করে কে ? এদিকে খোদ কর্ত্তার হুকুম—অমান্যই বা করি কি প্রকারে ? গেলেই গিন্নী বড় রাগ করিবেন, তাও জানি। দুই চারি বার বুড়ীকে বুঝাইলাম—বলিলাম, "একটু সাবধান হ'য়ে দিও থুইও"—কিন্তু সে ভয়ে আর যাইতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই, আমি হাত ধুইয়া, মুখ মুছিয়া, পরিষ্কার হইয়া, কাপড়খানা গুছাইয়া পরিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া, পরিবেশন করিতে গেলাম। কে জানে যে এমন কাণ্ড বাধিবে ? আমি জানি যে, আমি বড় বুদ্ধিমতী—জানিতাম না যে, সুভাষিণী আমায় এক হাটে বেচিতে পারে, আর এক হাটে কিনিতে পারে।

আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল। আমি বিদ্যুচ্চমকিতের ন্যায় একটু অন্যমনস্ক হইলাম। মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছি। আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ করি নাই। তত পাপ এ হৃদয়ে ছিল না। তবে সাপও বুঝি, জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরে না; ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলেই ফণা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। সাপেরও পাপহৃদয় না হইতে পারে। বুঝি সেইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে। বুঝি তিনি একটা কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া,

মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদয় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম। আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া বড় অপ্রফুল্ল হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া আমার যেন মনে হইল, আমি ইহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমন সময়ে রামরাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রামরাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ, উনি রাঁধেন ভাল।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "তোমার মাথামুণ্ড রাঁধি।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে, আপনার বাড়ীতে দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি।" বস্তুতঃ দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজদেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, "তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার যো পাইলেন, একবারে আমার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

আমার প্রথম সমস্যা, কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব, না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল, এখন আর একটা কথা বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম, "আমাদের বাড়ী কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এই মাত্র যে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম যে, তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন, "উপেন্দ্র বাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল?" আমি মাংসের পাত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হারাণীর হাসিবন্ধ

এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে পাঁচ শত বার আমার স্বামীর নাম করা আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দাও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার নাম করিব? পাঁচ শত বার "স্বামী" "স্বামী" করিয়া কান জ্বালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব? না, "প্রাণনাথ" "প্রাণকান্ত" "প্রাণেশ্বর" প্রাণপতি" এবং "প্রাণাধিকে"র ছড়াছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (দাসদাসীগণের অনুকরণ করিয়া) স্বামীকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মনে মনে স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"

এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্ব্বাটীতে গমনকালে যে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে মনে বলিলাম যে, "যদি ইনি এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই।" আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে

মার্জ্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় বড় খাটো করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রে অগ্রে রমণ বাবু গেলেন; তিনি চারি দিক্ চাহিতে চাহিতে গেলেন, যেন খবর লইতেছেন, কে কোথায় আছে। তার পর রামরাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর আমার স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারি দিকে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয়, "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

আমি তখন হারাণীর শরণাগত হইব মনে করিলাম। নিভৃতে ডাকিবামাত্র সে হাসিতে হাসিতে আসিল। সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "পরিবেশনের সময় বামন ঠাকুরাণীর নাকালটা দেখিয়াছিলে?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার হাসির ফোয়ারা খুলিল।

আমি বলিলাম, "তা জানি, কিন্তু আমি তার জন্য তোকে ডাকি নাই। আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর্। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধুঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল। হারাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "ছি! দিদি ঠাকরুন্! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ্—আমার এ উপকার করবি কি না বল্।"

হারাণী বলিল, "কিছুতেই আমা হইতে এ কাজ হইবে না।"

আমি খালি হাতে হারাণীর কাছে আসি নাই। মাহিয়ানার টাকা ছিল; পাঁচটা তাহার হাতে দিলাম। বলিলাম, "আমার মাথা খাস্, এ কাজ তোকে করিতেই হইবে।"

হারাণী টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু তাহা না দিয়া, নিকটে উনান নিকাইবার এক ঝুড়ি মাটি ছিল, তাহার উপর রাখিয়া দিল। বলিল—অতি গম্ভীরভাবে, আর হাসি নাই—"তোমার টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলাম, কিন্তু শব্দ হইলে একটা কেলেঙ্কারী হইবে, তাই আস্তে আস্তে এইখানে রাখিলাম—কুড়াইয়া লও। আর এ সকল কথা মুখে এনো না।"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। হারাণী বিশ্বাসী, আর সকলে অবিশ্বাসী, আর কাহাকে

ধরিব ? আমার কান্নার প্রকৃত তাৎপর্য্য সে জানিত না। তথাপি তার দয়া হইল। সে বলিল, "কাঁদ কেন ? চেনা মানুষ না কি ?"

আমি একবার মনে করিলাম, হারাণীকে সব খুলিয়া বলি। তার পর ভাবিলাম, সে এত বিশ্বাস করিবে না, একটা বা গণ্ডগোল করিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্থির করিলাম, সুভাষিণী ভিন্ন আমার গতি নাই। সেই আমার বুদ্ধি, সেই আমার রক্ষাকারিণী—তাহাকে সব খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ করি গিয়া। হারাণীকে বলিলাম, "চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুনিলে তুই বিশ্বাস করিবি না, তাই তোকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম না। কিছু দোষ নাই।"

"কিছু দোষ নাই," বলিয়া একটু ভাবিলাম। আমারই পক্ষে কিছু দোষ নাই, কিন্তু হারাণীর পক্ষে ? দোষ আছে বটে। তবে তাকে কাদা মাখাই কেন ? তখন সেই "বাজিয়ে যাব মল" মনে পড়িল। কুতর্কে মনকে বুঝাইলাম। যাহার দুর্দ্দশা ঘটে, সে উদ্ধারের জন্য কুতর্ক অবলম্বন করে। আমি হারাণীকে আবার বুঝাইলাম, "কিছু দোষ নাই।"

হা। তোমাকে কি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে হইবে ?

আমি। হাঁ।

হা। কখন ?

আমি। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে।

হা। একা ?

আমি। একা।

হা। আমার বাপের সাধ্য নহে।

আমি। আর বৌ ঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন ?

হা। তুমি কি পাগল হয়েছ ? তিনি কুলের কুলবধূ—সতী লক্ষ্মী, তিনি কি এ সব কাজে হাত দেন !

আমি। যদি বারণ না করেন, যাবি ?

হারাণী। যাব। তাঁর হুকুমে না পারি কি ?

আমি। যদি বারণ না করেন ?

হারাণী। যাব, কিন্তু তোমার টাকা নিব না। তোমার টাকা তুমি নাও।

আমি। আচ্ছা, তোকে যেন সময়ে পাই।

আমি তখন চোখের জল মুছিয়া সুভাষিণীর সন্ধানে গেলাম। তাহাকে নিভৃতেই পাইলাম। আমাকে দেখিয়া সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি, যেন সকালের পদ্মের মত, যেন সন্ধ্যাবেলার গন্ধরাজের মত, আহ্লাদে ফুটিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ, যেন সকালবেলার সর্ব্বত্র

পুষ্পিত শেফালিকার মত, যেন চন্দ্রোদয়ে নদীস্রোতের মত, আনন্দে প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন চিনিয়াছ ত ?"

আমি আকাশ থেকে পড়িলাম। বলিলাম, "সে কি ? তুমি কেমন ক'রে জানলে ?" সুভাষিণী মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহাঃ, তোমার সোনার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছে ? আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিয়েছি !"

আমি বলিলাম, "তোমরা কে ? তুমি আর র-বাবু ?"

সুভা। না ত আবার কে ? তুমি, তোমার স্বামী শ্বশুরের আর তাঁদের গাঁয়ের নাম বলিয়া দিয়াছিলে, মনে আছে ? তাই শুনিয়াই র-বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তারই ছল করিয়া তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তার পর নিমন্ত্রণ।

আমি। তার পর হাত পাতিয়া বুড়ীর দালটুকু নেওয়া।

সুভা। হাঁ, সেটাও আমাদের ষড়্‌যন্ত্র।

আমি। তা, আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি ?

সুভা। আ সর্ব্বনাশ ! তা কি দেওয়া যায় ? তোমাকে ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার পর কোথায় গিয়েছিলে, কি বৃত্তান্ত, তা কে জানে ? তোমার পরিচয় পেলে কি ঘরে নেবে ? বলবে একটা গতিয়ে দিচ্চে। র-বাবু বলেন, এখন তুমি নিজে যা করিতে পার।

আমি। আমি একবার কপাল ঠুকিয়া দেখিব—না হয় ডুবিয়া মরিব। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হইলে, কি করিব ?

সুভা। কখন্ দেখা করবে, কোথায় বা দেখা করবে ?

আমি। তোমরা যদি এত করিয়াছ, তবে এ বিষয়েও একটু সাহায্য কর। তাঁর বাসায় গেলে দেখা হইবে না,—কেই বা আমাকে নিয়ে যাবে, কেই বা দেখা করাইবে ? এইখানেই দেখা করিতে হইবে।

সুভা। কখন্ ?

আমি। রাত্রে, সবাই শুইলে।

সুভা। অভিসারিকে ?

আমি। তা বৈ আর গতি কি ? দোষই বা কি—স্বামী যে।

সুভা। না, দোষ নাই। কিন্তু তাহা হইলে তাঁকে রাত্রে আটকাইতে হয়। নিকটে তাঁর বাসা ; তা ঘটিবে কি ? দেখি একবার র-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

সুভাষিণী রমণ বাবুকে ডাকাইল। তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমাকে

আসিয়া বলিল। বলিল, "র-বাবু যাহা পারেন, তাহা এই :—তিনি এখন মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিবেন না—একটা ওজর করিয়া রাখিবেন। কাগজ দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পর সময় অবধারণ করিবেন। সন্ধ্যার পর তোমার স্বামী আসিলে, কাগজপত্র দেখিবেন। কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে একটু রাত্র করিবেন। রাত্র হইলে আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তার পর তোমার বিদ্যায় যা থাকে, তা করিও। রাত্রে থাকিতে আমরা কি বলিয়া অনুরোধ করিব ?"

আমি বলিলাম, "সে অনুরোধ তোমাদের করিতে হইবে না। আমিই করিব। আমার অনুরোধ যাহাতে শুনেন, তাহা করিয়া রাখিয়াছি। দুই একটা চাহনি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলাম, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন। লোক ভাল নহেন। এখন আমার অনুরোধ তাঁহার কাছে পাঠাই কি প্রকারে ? এক ছত্র লিখিয়া দিব। সেই কাগজটুকু কেহ তাঁর কাছে দিয়ে এলেই হয়।"

সুভা। কোন চাকরের হাতে পাঠাও না ?

আমি। যদি জন্ম-জন্মান্তরেও স্বামী না পাই, তবুও পুরুষ মানুষকে এ কথা বলিতে পারি না।

সুভা। তা বটে। কোন ঝি ?

আমি। ঝি বিশ্বাসী কে ? একটা গোলমাল বাধাইবে, তখন সব খোওয়াব।

সুভা। হারাণী বিশ্বাসী।

আমি। হারাণীকে বলিয়াছিলাম। বিশ্বাসী বলিয়া সে নারাজ। তবে তোমার একটু ইঙ্গিত পাইলে সে যাইতে পারে। কিন্তু তোমায় এমন ইঙ্গিত করিতে কি প্রকারে বলিতে পারি ? মরি, ত আমি একাই মরিব।—পোড়া চোখে আবার জল আসিল।

সুভা। হারাণী আমার কথা কি বলিয়াছে ?

আমি। তুমি যদি বারণ না কর, তবে সে যাইতে পারে।

সুভাষিণী অনেকক্ষণ ভাবিল। বলিল, "সন্ধ্যার পর তাকে এই কথার জন্য আসিতে বলিও।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমাকে একজামিন দিতে হইল

সন্ধ্যার পর আমার স্বামী কাগজপত্র লইয়া রমণ বাবুর কাছে আসিলেন। সংবাদ পাইয়া, আমি আর একবার হারাণীর হাতে পায়ে ধরিলাম। হারাণী সেই কথাই বলে, "বৌদিদি

যদি বারণ না করে, তবে পারি। তবে জানিব, এতে দোষ নেই।" আমি বলিলাম, "যাহা হয় কর্—আমার বড় জ্বালা।"

এই ইঙ্গিত পাইয়া হারাণী একটু হাসিতে হাসিতে সুভাষিণীর কাছে ছুটিল। আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া, আলু থালু কেশ বেশ সামলাইতে সামলাইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ছুটিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো, এত হাসি কেন?"

হারাণী। দিদি, এমন জায়গায়ও মানুষকে পাঠায়? প্রাণটা গিয়াছিল আর কি!

আমি। কেন গো?

হারা। আমি জানি বৌদিদির ঘরে ঝাঁটা থাকে না, দরকারমত ঝাঁটা লইয়া গিয়া আমরা ঘর ঝাঁটাইয়া আসি। আজ দেখি যে, বৌদিদির হাতের কাছেই কে ঝাঁটা রাখিয়া আসিয়াছে। আমি যেমন গিয়া বলিলাম, "তা যাব কি?" অমনি বৌদিদি সেই ঝাঁটা লইয়া আমাকে তাড়াইয়া মারিতে আসিল। ভাগ্যিস্ পালাতে জানি, তাই পালিয়ে বাঁচলেম। নহিলে খেঙ্গরা খেয়ে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? তবু এক ঘা বুঝি পিঠে পড়েছে;—দেখ দেখি দাগ হয়েছে কি না?"

হারাণী হাসিতে হাসিতে আমাকে পিঠ দেখাইল। মিছে কথা—দাগ ছিল না। তখন সে বলিল, "এখন কি করতে হবে বল—ক'রে আসি!"

আমি। ঝাঁটা খেয়ে যাবি?

হারাণী। ঝাঁটা মেরেছে—বারণ ত করে নি। আমি বলেছিলাম, বারণ না করে ত যাব।

আমি। ঝাঁটা কি বারণ না?

হারাণী। হাঁ, দেখ দিদিমণি, বৌদিদি যখন ঝাঁটা তোলে, তখন তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখেছিলাম। তা কি করতে হবে, বল।

আমি তখন এক টুকরা কাগজে লিখিলাম,

"আমি আপনাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। গ্রহণ করিবেন কি? যদি করেন, তবে আজ রাত্রিতে এই বাড়ীতে শয়ন করিবেন। ঘরের দ্বার যেন খোলা থাকে।

সেই পাচিকা।"

পত্র লিখিয়া, লজ্জায় ইচ্ছা করিতে লাগিল, পুকুরের জলে ডুবিয়া থাকি, কি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকি। তা কি করিব? বিধাতা যেমন ভাগ্য দিয়াছেন! বুঝি আর কখন কোন কুলবতীর কপালে এমন দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

কাগজটা মুড়িয়া সুড়িয়া হারাণীকে দিলাম। বলিলাম, "একটু সবুর।" সুভাষিণীকে

৭

বলিলাম, "একবার দাদা বাবুকে ডাকিয়া পাঠাও। যাহা হয়, একটা কথা বলিয়া বিদায় দিও।" সুভাষিণী তাই করিল। রমণ বাবু উঠিয়া আসিলে, হারাণীকে বলিলাম, "এখন যা।" হারাণী গেল, কিছু পরে কাগজটা ফেরত দিল। তার এক কোণে লেখা আছে, "আচ্ছা।" আমি তখন হারাণীকে বলিলাম, "যদি এত করিলি, তবে আর একটু করিতে হইবে। দুপর রাত্রে আমাকে তাঁর শুইবার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।"

হারাণী। আচ্ছা, কোন দোষ নাই ত?

আমি। কিছু না। উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন।

হারাণী। আর জন্মে, কি এ জন্মে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "চুপ।"

হারাণী হাসিয়া বলিল, "যদি এ জন্মের হন, তবে আমি পাঁচ শত টাকা বখ্‌শিশ নিব; নহিলে আমার ঝাঁটার ঘা ভাল হইবে না।"

আমি তখন সুভাষিণীর কাছে গিয়া এ সকল সংবাদ দিলাম। সুভাষিণী শাশুড়ীকে বলিয়া আসিল, "আজ কুমুদিনীর অসুখ হইয়াছে; সে রাঁধিতে পারিবে না। সোনার মা'ই রাঁধুক।"

সোনার মা রাঁধিতে গেল—সুভাষিণী আমাকে লইয়া গিয়া ঘরে কবাট দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি, কয়েদ কেন?" সুভাষিণী বলিল, "তোমায় সাজাইব।"

তখন আমার মুখ পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া দিল। চুলে সুগন্ধ তৈল মাখাইয়া, যত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল; বলিল, "এ খোঁপার হাজার টাকা মূল্য, সময় হইলে আমায় এ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিস্।" তার পর আপনার একখানা পরিষ্কার, রমণীমনোহর বস্ত্র লইয়া জোর করিয়া পরাইতে লাগিল। সে যেরূপ টানাটানি করিল, বিবস্ত্রা হইবার ভয়ে আমি পরিতে বাধ্য হইলাম। তার পর আপনার অলঙ্কাররাশি আনিয়া পরাইতে আসিল। আমি বলিলাম, "এ আমি কিছুতেই পরিব না।"

তার জন্য অনেক বিবাদ বচসা হইল—আমি কোন মতেই পরিলাম না দেখিয়া সে বলিল, "তবে, আর এক সুট আনিয়া রাখিয়াছি, তাই পর।"

এই বলিয়া সুভাষিণী একটা ফুলের জার্ডিনিয়র হইতে বাহির করিয়া মল্লিকা ফুলের অফুল্ল কোরকের বালা পরাইল, তাহার তাবিজ, তাহারই বাজু, গলায় তারই দোনর মালা। তার পর এক জোড়া নূতন সোনার ইয়ার্‌রিং বাহির করিয়া বলিল, "এ আমি নিজের টাকায় র-বাবুকে দিয়া কিনিয়া আনাইয়াছি—তোমাকে দিবার জন্য। তুমি যেখানে যখন থাক, এ পরিলে আমাকে তুমি মনে করিবে। কি জানি ভাই, আজ বৈ তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়—ভগবান্ তাই করুন,—তাই তোমাকে আজ এ ইয়ার্‌রিং পরাইব। এতে আর না বলিও না।"

বলিতে বলিতে সুভাষিণী কাঁদিল। আমারও চক্ষে জল আসিল, আমি আর না বলিতে পারিলাম না। সুভাষিণী ইয়ার্‌রিং পরাইল।

সাজসজ্জা শেষ হইলে সুভাষিণীর ছেলেকে ঝি দিয়া গেল। ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিলাম। সে একটু গল্প শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর মনে একটি দুঃখের কথা উদয় হইয়াছিল, তাও এ সুখের মাঝে সুভাষিণীকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিতেছি। আমি চিনিয়াছি যে, তিনি আমার স্বামী, এই জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, দোষ নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী,—তাঁহাকে মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিব না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।"

সুভাষিণী আমার কথা শুনিয়া বলিল, "তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।"

আমি। আমার কি স্বামী আছে না কি ?

সুভা। আ ম'লো! মেয়ে মানুষে পুরুষ মানুষে সমান! তুই কমিসেরিয়েটের কাজ ক'রে টাকা নিয়ে আয় না দেখি ?

আমি। ওরা পেটে ছেলে ধরিয়া, প্রসব করিয়া, মানুষ করুক, আমি কমিসেরিয়েটে যাইব। যে যা পারে, সে তা করে। পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয় দমন কি এতই শক্ত ?

সুভা। আচ্ছা, আগে তোর ঘর হোক, তার পর তুই ঘরে আগুন দিস্। ও সব কথা রাখ্। কেমন ক'রে স্বামীর মন ভুলাবি, তার একজামিন দে দেখি ? তা নইলে ত তোর গতি নেই।

আমি একটু ভাবিত হইয়া বলিলাম, "সে বিদ্যা ত কখনও শিখি নাই।"

সু। তবে আমার কাছে শেখ্। আমি এ শাস্ত্রে পণ্ডিত, তা জানিস্ ?

আমি। তা ত দেখিতে পাই।

সু। তবে শেখ্। তুই যেন পুরুষ মানুষ। আমি কেমন করিয়া তোর মন ভুলাই দেখ্।

এই বলিয়া পোড়ারমুখী, মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া, সযত্নে স্বহস্তে প্রস্তুত সুবাসিত

একটি পান আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। সে পান সে কেবল রমণ বাবুর জন্য রাখে, আর কাহাকেও দেয় না। এমন কি, আপনিও কখন খায় না। রমণ বাবুর আলবোলাটা সেখানে ছিল, তাহাতে কল্কে বসান ; গুলের ছাই ছিল মাত্র ; তাই আমার সমুখে ধরিয়া দিয়া, ফুঁ দিয়া ধরান, সুভাষিণী নাটিত করিল। তার পর, ফুল দিয়া সাজান তালবৃন্তখানি হাতে লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। হাতের বালাতে চুড়িতে বড় মিঠে মিঠে বাজিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "ভাই! এ ত দাসীপনা—দাসীপনায় আমার কত দূর বিদ্যা, তারই পরিচয় দিবার জন্য কি তাঁকে আজ ধরিয়া রাখিলাম ?"

সুভাষিণী বলিল, "আমরা দাসী না ত কি ?"

আমি বলিলাম, "যখন তাঁর ভালবাসা জন্মিবে, তখন দাসীপনা চলিবে। তখন পাখা করিব, পা টিপিব, পান সাজিয়া দিব, তামাকু ধরাইয়া দিব। এখনকার ওসব নয়।"

তখন সুভাষিণী হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বসিল। আমার হাতখানা আপনার হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া, মিঠে মিঠে গল্প করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম, হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, কাণবালা দোলাইয়া, সে যে সং সাজিয়াছিল, তারই অনুরূপ কথা কহিতে লাগিল। কথায় কথায় সে ভাব ভুলিয়া গেল। সখীভাবেই কথা কহিতে লাগিল। আমি যে চলিয়া যাইব, সে কথা পাড়িল। চক্ষুতে তার এক বিন্দু জল চক চক করিতে লাগিল। তখন তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলাম, "যা শিখাইলে, তা স্ত্রীলোকের অস্ত্র বটে, কিন্তু এখন উ-বাবুর উপর খাটিবে কি ?"

সুভাষিণী তখন হাসিয়া বলিল, "তবে আমার ব্রহ্মাস্ত্র শিখে নে।"

এই বলিয়া, মাগী আমার গলা বেড়িয়া হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, আমার মুখচুম্বন করিল। এক ফোঁটা চোখের জল, আমার গালে পড়িল।

ঢোক গিলিয়া আমার চোখের জল চাপিয়া, আমি বলিলাম, "এ যে ভাই সঙ্কল্প না হতে দক্ষিণা দেওয়া শিখাইতেছিস্।"

সুভাষিণী বলিল, "তোর তবে বিদ্যা হবে না। তুই কি জানিস্, একজামিন দে দেখি। এই আমি যেন উ-বাবু" এই বলিয়া সে সোফার উপর জমকাইয়া বসিয়া,—হাসি রাখিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিল। হাসি থামিলে, একবার আমার মুখ পানে খট্ মট্ করিয়া চাহিল—আবার তখনই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি থামিলে বলিল, "একজামিন দে।" তখন যে বিদ্যার পরিচয় পাঠক পশ্চাৎ পাইবেন, সুভাষিণীকেও তাহার কিছু পরিচয় দিলাম। সুভাষিণী আমাকে সোফা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা ! তুই আস্ত কেউটে !"

আমি বলিলাম, "কেন ভাই ?"

সুভাষিণী বলিল, "ও হাসি চাহনিতে পুরুষ মানুষ টিকে ? মরিয়া ভূত হয়।"

আমি। তবে একজামিন পাস ?

সু। খুব পাস—কমিসেরিয়েটের এক-শ উনসত্তর পুরুষেও এমন হাসি চাহনি কখন দেখে নাই। মিন্‌সের মুণ্ডটা যদি ঘুরে যায়, ত একটু বাদামের তেল দিস্।

আমি। আচ্ছা। এখন সাড়া শব্দে বুঝিতে পারিতেছি, বাবুদের খাওয়া হইয়া গেল। রমণ বাবুর ঘরে আসিবার সময় হইল, আমি এখন বিদায় হই। যা শিখাইয়াছিলে, তার মধ্যে একটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল—সেই মুখচুম্বনটি। এসো আর একবার শিখি।

তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরস্পরে মুখচুম্বন করিয়া, গলা ধরাধরি করিয়া, দুই জনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয় ? সুভাষিণীর মত আর কি কেহ ভালবাসিতে জানে ? মরিব, কিন্তু সুভাষিণীকে ভুলিব না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা

আমি হারাণীকে সতর্ক করিয়া দিয়া আপনার শয়নগৃহে গেলাম। বাবুদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একটা বড় গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কেহ ডাকে পাখা, কেহ ডাকে জল, কেহ ডাকে ঔষধ, কেহ ডাকে ডাক্তার। এইরূপ হুলস্থূল। হারাণী হাসিতে হাসিতে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত গণ্ডগোল কিসের ?"

হা। সেই বাবুটি মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।

আমি। তার পর ?

হা। এখন সামলেছেন।

আমি। তার পর ?

হা। এখন বড় অবসন্ন—বাসায় যাইতে পারিলেন না। এখানেই বড় বৈঠকখানার পাশের ঘরে শুইলেন।

বুঝিলাম, এ কৌশল। বলিলাম, "আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে আসিবে।"

হারাণী বলিল, "অসুখ যে গা।"

আমি বলিলাম, "অসুখ না তোর মুণ্ড। আর পাঁচ-শ খানা বিবির মুণ্ড, যদি দিন পাই।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে গেল। পরে আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে, হারাণী

আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘর দেখাইয়া দিয়া আসিল। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি একাই শয়ন করিয়া আছেন। অবসন্ন কিছুই না; ঘরে দুইটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, তিনি নিজের রূপরাশিতে সমস্ত আলো করিয়া আছেন। আমিও শরবিদ্ধ; আনন্দে শরীর আপ্লুত হইল।

যৌবন প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে দুপ দুপ শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ—তবে কাঁদ কেন?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্ম্মপীড়া হইল। তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষুর প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন, যদি মনে করেন যে, "ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্যলোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে"—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষুর জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।"

তাঁর চক্ষের প্রতি আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, তিনি বড় বিস্ময়ের সহিত আমাকে দেখিতেছিলেন। তাঁর কথার উত্তরে আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব।" এই ছলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। না।

বড় বড় কথায়, উত্তর দিবার তাঁহার অবসর দেখিলাম না। আমি উপযাচিকা, অভিসারিকা হইয়া আসিয়াছি,—আমাকে আদর করিবারও তাঁর অবসর নাই। তিনি

সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একবারমাত্র বলিলেন, "এমন রূপ ত মানুষের দেখি নাই।"

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড়লোক, এটি তেমনই বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পর আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমন বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না! আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথা হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?"

তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয়! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আমি স্বামিশয্যায় বসিয়া তাঁহার অনিন্দিত মোহনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুলের বাহির

তখন সে চিন্তিত ভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি আমার বশীভূত হইয়াছেন। মনে মনে কহিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গ-প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর দন্ত-প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহা প্রয়োগ করিব। যদি কখন "মল বাজিয়ে" যেতে হয়, তবে সে এখন। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার নিকটে আসিবেন না, আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি," [হাসিতে হাসিতে আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে বলিতে কবরী-মোচনপূর্ব্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে ?) আবার বাঁধিতে

বসিলাম,] "আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সংবাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।"

বোধ হয়, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ," এই বলিয়া আমি যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাহিতে চাহিতে, আমার কুঞ্চিত, মসৃণ, সুবাসিত অলকদামের প্রান্তভাগ, যেন অনবধানে, তাঁহার গণ্ড স্পর্শ করাইয়া সন্ধ্যার বাতাসে বসন্তের লতার মত একটু হেলিয়া, গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন, আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। মল্লিকাকোরকের বালার উপর তাঁর হাত পড়িল। তিনি হাতখানা ধরিয়া রাখিয়া যেন বিস্মিতের মত হাতের পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিতেছ কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "এ কি ফুল? এ ফুল ত মানায় নাই। ফুলটার অপেক্ষা মানুষটা সুন্দর। মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।" আমি রাগ করিয়া হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, "তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না।"

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাতযোড় করিয়া ডাকিলেন, "আমার কথা রাখ, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই। আর একটু দেখি। এমন আর কখন দেখিব না।" আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি কোন্ ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব? ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র প্রধান ধন—এক দিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আমি না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনার কাছে আসিয়াছি। না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমি একেবারে অধঃপাতে যাই নাই। এখনও আমার রক্ষার পথ খোলা আছে। আমার ভাগ্য যে, সে কথা এখন আমার মনে পড়িল। আমি চলিলাম।"

তিনি বলিলেন, "তোমার ধর্ম্ম তুমি জান। আমায় এমন দশায় ফেলিয়াছ যে, আমার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আমি শপথ করিতেছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য মনে করিও না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই। এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে কি এত হয়?" এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসিলাম। তখন আর

ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথরোধ করিলেন। বলিলেন, "আমি যে এমন আর কখন দেখি নাই!" তাঁহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখও হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্প দূর। তাঁর গাড়ীও হাজির ছিল, এবং দ্বারবানেরা নিদ্রিত। আমরা নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তাঁর বাসায় গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কিন্তু দেখি, তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনি ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না; অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য সন্তাপে, দারুণ তৃষাপীড়িত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয়তীরে বসাইয়া দিয়া, মুখ বাঁধিয়া দাও, যেন সে জল পান করিতে না পারে—বল দেখি, তার জলে ভালবাসা বাড়িবে কি না?

অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রিতে এত জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে

পারি না। যদি আমার কোন পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এইরূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে, এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য হইত।

এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনি, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। তাঁর এতটুকু অসুখ দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতাম।

এখন যুক্তকরে আপনাদের নিকট নিবেদন যে, আপনারা না মনে করেন যে, এ সকলই কৃত্রিম। ইন্দিরার মনে এতটুকু গর্ব্ব আছে যে, কেবল ভরণপোষণের লোভে, অথবা স্বামীর ধনে ধনেশ্বরী হইব, এই লোভে, সে এই সকল করিতে পারে না। স্বামী পাইব এই লোভে, কৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিতাম না; ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হইব, এমন লোভেও পারিতাম না। স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া হাসি চাহনির ঘটা ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া কৃত্রিম ভালবাসা ছড়াইতে পারি না। ভগবান্ সে মাটিতে ইন্দিরাকে গড়েন নাই। যে অভাগী এ কথাটা না বুঝিতে পারিবে,—যে নারকিণী আমায় বলিবে, "হাসি চাহনির ফাঁদ পাতিতে পার, খোঁপা খুলিয়া আবার বাঁধিতে পার, কথার ছলে সুগন্ধি কুঞ্চিতালকগুলি হতভাগ্য মিন্‌সের গালে ঠেকাইয়া তাকে রোমাঞ্চিত করিতে পার—আর পার না তার পাখানি তুলিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে, কিম্বা হুঁকার ছিলিমটায় ফুঁ দিতে"!—যে হতভাগী আমাকে এমন কথা বলিবে, সে পোড়ারমুখী আমার এই জীবনবৃত্তান্ত যেন পড়ে না।

তা, তোমরা পাঁচ রকমের পাঁচ জন মেয়ে আছ, পুরুষ পাঠকদিগের কথা আমি ধরি না—তাহারা এ শাস্ত্রের কথা কি বুঝিবে—তোমাদের আসল কথাটা বুঝাইয়া বলি। ইনি আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই,—কৃত্রিম নহে—সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, আমি তাহা করিতেছিলাম। মনে মনে করিতেছিলাম যে, যদি আমাকে গ্রহণ নাই করেন, তবে আমার পক্ষে পৃথিবীর যে সার সুখ,—যাহা আর কখনও ঘটে নাই, আর

কখনও ঘটিতে নাও পারে, তাহা অন্ততঃ এই কয় দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লই। তাই প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা করিতেছিলাম। ইহাতে কি পরিমাণে সুখী হইতেছিলাম, তা তোমরা কেহ বুঝিবে, কেহ বুঝিবে না।

পুরুষ পাঠককে দয়া করিয়া কেবল হাসি চাহনির তত্ত্বটা বুঝাইব। যে বুদ্ধি কেবল কালেজের পরীক্ষা দিলেই সীমাপ্রান্তে পৌঁছে, ওকালতিতে দশ টাকা আনিতে পারিলেই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহার অভাবই রাজদ্বারে সম্মানিত, সে বুদ্ধির ভিতর পতিভক্তিতত্ত্ব প্রবেশ করান যাইতে পারে না। যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষ মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি? তবে হাসি চাহনির তত্ত্বটা যে দয়া করিয়া বুঝাইব বলিয়াছি, তার কারণ, সেটা বড় মোটা কথা। যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, কোচমান্ ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, রাখাল গোরুকে পাঁচনবাড়ির দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনই হাসি চাহনিতে তোমাদের বশ করি। আমাদিগের পতিভক্তি আমাদের গুণ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ।

তোমরা বলিবে, এ অত্যন্ত অহঙ্কারের কথা। তা বটে—আমরাও মাটির কলসী, ফুলের ঘায়ে ফাটিয়া যাই। আমার এ অহঙ্কারের ফল হাতে হাতে পাইতেছিলাম। যে ঠাকুরটির অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্ব্বাণ আছে,—মা বাপ নাই,* অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হয়; সেই দেবতা স্ত্রীজাতির গর্ব্বখর্ব্বকারী। আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম। বলিয়াছি, তাঁহার রূপ মনোহর রূপ—তাতে আবার জানিয়াছি, যাঁর এ রূপরাশি, তিনি আমারই সামগ্রী;—

তাহারই সোহাগে, আমি সোহাগিনী,
রূপসী তাহারই রূপে।

তার পর এই আগুনের ছড়াছড়ি! আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উতোর নাই? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পাল্টা চাহনি নাই? আমার অধরোষ্ঠ দূর হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার প্রফুল্লরক্ত-পুষ্পতুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমনি করিয়া, ফুটিয়া উঠিয়া, পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে

* আত্মযোনি।

ফিরিতে জানে না ? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ। যে দেবতা, ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।

পরীক্ষার কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু আমি তাঁহার ভালবাসার এমনই অধীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, পরীক্ষার কাল অতীত হইলে তিনি আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও যাইব না। পরিণামে যদি তিনি আমার পরিচয় পাইয়াও যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, গণিকার মতও যদি তাঁহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাও থাকিব, স্বামীকে পাইলে, লোকলজ্জাকে ভয় করিব না। কিন্তু যদি কপালে তাও না ঘটে, এই ভয়ে অবসর পাইলেই কাঁদিতে বসিতাম।

কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাণনাথের পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে। আর উড়িবার শক্তি নাই। তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতি পদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিত মাত্রে স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার দশা বড় মন্দ হইবে।

পরীক্ষা ফাঁসিয়া গেল। অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম। তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম। কিন্তু আমি যাই হই, হাতীর পায়ে শিকল পরাইয়াছি, ইহা বুঝিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক

আমরা কলিকাতায় দিনকত সুখে সচ্ছন্দে রহিলাম। তার পর দেখিলাম, স্বামী একদিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বিমর্ষ কেন ?"

তিনি বলিলেন, "বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে। বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি!" আমি দাঁড়াইয়াছিলাম—মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া আমায় তুলিয়া মুখচুম্বন করিয়া, অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম। তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

আমি। সেখানে আমাকে কি বলিয়া পরিচিত করিবে?—কি প্রকারে, কোথায় রাখিবে?

তিনি। তাই ভাবিতেছি। সহর নহে যে, আর একটা জায়গায় রাখিব, কেহ বড় জানিতে পারিবে না। বাপ মার চক্ষের উপর, তোমায় কোথায় রাখিব?

আমি। না গেলেই কি নয়?

তিনি। না গেলেই নয়।

আমি। কত দিনে ফিরিবে? শীঘ্র ফের যদি, তবে আমাকে না হয়, এইখানেই রাখিয়া যাও।

তিনি। শীঘ্র ফিরতে পারিব, এমন ভরসা নাই। কলিকাতায় আমরা কালেভদ্রে আসি।

আমি। তুমি যাও—আমি তোমার জঞ্জাল হইব না। (বিস্তর কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিলাম) আমার কপালে যা থাকে, তাই ঘটিবে।

তিনি। কিন্তু আমি যে তোমায় না দেখিলে পাগল হইব।

আমি। দেখ, আমি ত তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নহি—(স্বামী মহাশয় একটু নড়িয়া উঠিলেন)—তোমার উপর আমার কোন অধিকার নাই। আমাকে তুমি এ সময় বিদায়—

তিনি আমাকে আর কথা কহিতে দিলেন না। বলিলেন, "আজ আর এ কথায় কাজ নাই। আজ ভাবি। যা ভাবিয়া স্থির করিব, কাল বলিব।"

বৈকালে তিনি রমণ বাবুকে আসিতে লিখিলেন। লিখিলেন, "গোপনীয় কথা আছে। এখানে না আসিলে বলা হইবে না।"

রমণ বাবু আসিলেন। আমি কবাটের আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম, কি কথা হয়। স্বামী বলিলেন, "আপনাদিগের সেই পাচিকাটি—যে অল্পবয়সী—তাহার নাম কি?"

রমণ। কুমুদিনী।

উপেন্দ্র। তাহার বাড়ী কোথায়?

রমণ। এখন বলিতে পারি না।

উ। সধবা না বিধবা?

র। সধবা।

উ। তার স্বামী কে জানেন ?

র। জানি।

উ। কে ?

র। এক্ষণে বলিবার আমার অধিকার নাই।

উ। কেন, কিছু গুপ্ত রহস্য আছে নাকি ?

র। আছে।

উ। আপনারা উহাকে কোথায় পাইলেন ?

র। আমার স্ত্রী তাহার মাসীর কাছে উহাকে পাইয়াছেন।

উ। যাক্—এ সব বাজে কথা। উহার চরিত্র কেমন ?

র। অনিন্দনীয়। আমাদের বুড়ী রাঁধুনীটাকে বড় ক্ষেপাইত। তা ছাড়া একটি দোষও নাই।

উ। স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

র। এমন উৎকৃষ্ট চরিত্র দেখা যায় না।

উ। উহার বাড়ী কোথায়, কেন বলিতেছেন না ?

র। বলিবার অধিকার নাই।

উ। স্বামীর বাড়ী কোথায় ?

র। ঐ উত্তর!

উ। স্বামী জীবিত আছে ?

র। আছে।

উ। আপনি তাহাকে চেনেন ?

র। চিনি।

উ। ঐ স্ত্রীলোকটি এখন কোথায় ?

র। আপনার এই বাড়ীতে।

স্বামী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

র। আমার বলিবার অধিকার নাই। আপনার জেরা কি ফুরাইল ?

উ। ফুরাইল। কিন্তু আপনি ত জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, আমি কেন আপনাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ?

র। দুই কারণে জিজ্ঞাসা করিলাম না। একটি এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি বলিবেন না। সত্য কি না ?

উ। সত্য। দ্বিতীয় কারণটি কি ?

র। আমি জানি, যে জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

উ। তাও জানেন ? কি বলুন দেখি ?

র। তা বলিব না।

উ। আচ্ছা, আপনি ত সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি, আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে কি না ?

র। খুব ঘটিতে পারে। আপনি কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

উ। আর একটা কথা। আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সব একটা কাগজে লিখিয়া দিয়া দস্তখত করিয়া দিতে পারেন ?

র। পারি—এক সর্ত্তে। আমি লিখিয়া পুলিন্দায় সীল করিয়া কুমুদিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন না। দেশে গিয়া পড়িবেন। রাজি ?

স্বামী মহাশয় অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "রাজি। আমার অভিপ্রায়ের পোষক হইবে ত ?"

র। হইবে।

অন্যান্য কথার পর রমণ বাবু উঠিয়া গেলেন। উ-বাবু আমার নিকট আসিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সব কথা হইতেছিল কেন ?"

তিনি বলিলেন, "সব শুনিয়াছ না কি ?"

আমি। হাঁ শুনিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, আমি ত তোমায় খুন করিয়া, ফাঁসি গিয়াছি। ফাঁসির পর আর তদারক কেন ?

তিনি। এখনকার আইনে তা হইতে পারে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত

সে দিন, দিবারাত্রি, আমার স্বামী; অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা কহিলেন না—আমাকে দেখিলেই আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা আমার চিন্তার বিষয় বেশী ; কিন্তু তাঁকে চিন্তিত দেখিয়া, আমার প্রাণের ভিতর বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি আপনার দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নানা প্রকার গঠনের ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, ফুলের জিনিসপত্র গড়িয়া উপহার দিলাম, পানগুলা নানা রকমের সাজিলাম, নানা রকমের সুখাদ্য প্রস্তুত করিলাম,

আপনি কাঁদিতেছি, তবু নানা রসের রসভরা গল্পের অবতারণা করিলাম। আমার স্বামী বিষয়ী লোক—সর্ব্বাপেক্ষা বিষয়কর্ম্ম ভালবাসেন; তাহা বিচার করিয়া বিষয়কর্ম্মের কথা পাড়িলাম; আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, বিষয়কর্ম্ম না বুঝিতাম, এমন নহে। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার কান্নার উপর আরও কান্না বাড়িল।

পরদিন প্রাতে, স্নানাহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া, তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বোধ করি, যা জিজ্ঞাসা করিব, সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিবে?"

তখন রমণ বাবুকে জেরা করার কথাটা মনে পড়িল। বলিলাম, "যাহা বলিব, সত্যই বলিব। কিন্তু সকল কথার উত্তর না দিতে পারি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী জীবিত আছেন, শুনিলাম। তাঁর নাম্ ধাম প্রকাশ করিবে?"

আমি। এখন না। দিন কত যাক্।

তিনি। তিনি এখন কোথায় আছেন বলিবে?

আমি। এই কলিকাতায়।

তিনি। (একটু চমকিত হইয়া) তুমি কলিকাতায়, তোমার স্বামী কলিকাতায়, তবে তুমি তাঁর কাছে থাক না কেন?

আমি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।

পাঠক দেখিও, আমি সব সত্য বলিতেছি। আমার স্বামী এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "স্ত্রী পুরুষে পরিচয় নাই? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা!"

আমি। সকলের কি থাকে? তোমার কি আছে?

একটু অপ্রতিভ হইয়া তিনি বলিলেন, "সে ত কতকগুলা দুর্দ্দৈবে ঘটিয়াছে।"

আমি। দুর্দ্দৈব সর্ব্বত্র আছে।

তিনি। যাক্—তিনি ভবিষ্যতে তোমার উপর কোন দাবি দাওয়া করিবার সম্ভাবনা আছে কি?

আমি। সে আমার হাত। আমি যদি তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।

তিনি। তবে তোমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি কি পরামর্শ দাও শুনি।

আমি। বল দেখি।

তিনি। আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।

আমি। বুঝিলাম।

তিনি। বাড়ী গেলে শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।

আমি। তাও শুনিতেছি।

তিনি। তোমাকে ফেলিয়া যাইতেও পারিব না। তা হ'লে মরিয়া যাইব।

প্রাণ আমার কণ্ঠাগত, তবু আমি এক রাশি হাসি হাসিয়া বলিলাম, "পোড়া কপাল! ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি?"

তিনি। কোকিলের দুঃখ কাকে যায় না। আমি তোমাকে লইয়াই যাইব।

আমি। কোথায় রাখিবে? কি পরিচয়ে রাখিবে?

তিনি। একটা ভারি জুয়াচুরি করিব। তাই কাল সমস্ত দিন ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে কথা কহি নাই।

আমি। বলিবে যে, এই ইন্দিরা—রামরাম দত্তের বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইয়াছি।

তিনি। আ সর্ব্বনাশ! তুমি কে?

স্বামী মহাশয়, নিস্পন্দ হইয়া, দুই চক্ষের তারা উপর দিকে তুলিয়া, আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কি হইয়াছে?"

তিনি। ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে? আর আমার মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা জানিলে কি প্রকারে? তুমি মানুষ, না কোন মায়াবিনী?

আমি। সে পরিচয় পশ্চাৎ দিব। এখন আমি তোমাকে পাল্‌টা জেরা করিব, স্বরূপ উত্তর দাও।

তিনি। (সভয়ে) বল।

আমি। সে দিন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পাওয়া গেলেও তুমি গ্রহণ করিবে না; কেন না, তাহাকে ডাকাতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; তোমার জাতি যাইবে। আমাকে ইন্দিরা বলিয়া ঘরে লইয়া গেলে সে ভয় নাই কেন?

তিনি। সে ভয় নাই? খুবই আছে। তবে তাহাতে আমার প্রাণের দায় ছিল না— এখন আমার প্রাণ যায়—জাতি বড়, না প্রাণ বড়? আর সেটাও তেমন বিষম সঙ্কট নয়। ইন্দিরা যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা কেহ বলে না। কালাদীঘিতে যাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িয়াছে। তাহারা একরার করিয়াছে। একরারে বলিয়াছে, ইন্দিরার গহনাগাঁটি মাত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কেবল এখন সে কোথায় আছে, কি হইয়াছে, তাই কেহ জানে না; পাওয়া গেলে একটা কলঙ্কশূন্য বৃত্তান্ত অনায়াসেই তৈয়ার করিয়া বলা যাইতে পারে। ভরসা করি, রমণ বাবু যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাতে তাহার পোষকতা করিবে। তাতেও যদি কোন কথা উঠে, গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই গোল মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।

আমি। যদি সে আপত্তি কাটে, তবে আর আপত্তি কি ?

তিনি। গোল তোমাকে লইয়া। তুমি জাল ইন্দিরা, যদি ধরা পড় ?

আমি। তোমাদের বাড়ীতে আমাকেও কেহ চেনে না, আসল ইন্দিরাকেও কেহ চেনে না ; কেন না, কেবল একবার বালিকাবয়সে তাহাকে তোমরা দেখিয়াছিলে, তবে ধরা পড়িব কেন ?

তিনি। কথায়। নূতন লোক গিয়া জানা লোক সাজিলে সহজে কথায় ধরা পড়ে।

আমি। তুমি না হয়, আমাকে সব শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিবে।

তিনি। তা ত মনে করিয়াছি। কিন্তু সব কথা ত শিখান যায় না। মনে কর, যদি যে কথা শিখাইতে মনে হয় নাই, এমন কথা পড়ে, তবে ধরা পড়িবে। মনে কর, যদি কখন আসল ইন্দিরা আসিয়া উপস্থিত হয়, উভয়ের মধ্যে বিচারকালে, পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসাবাদ হইলে তুমিই ধরা পড়িবে।

আমি একটু হাসিলাম। এমন অবস্থায় হাসিটা আপনি আসে। কিন্তু এখন আমার প্রকৃত পরিচয় দিবার সময় হয় নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমায় কেহ ঠকাইতে পারে না। তুমি এইমাত্র আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে, আমি মানুষী কি মায়াবিনী। আমি মানুষী নহি, (তিনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন) আমি কি, তাহা পরে বলিব। এখন ইহাই বলিব যে, আমাকে কেহ ঠকাইতে পারে না।"

স্বামী মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ লোক। নহিলে এত অল্প দিনে এত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন না। মানুষটা বাহিরে একটু নীরস,—কাঠ কাঠ রকম, পাঠক তাহা বুঝিয়া থাকিবেন—কিন্তু ভিতরে বড় মধুর, বড় কোমল, বড় স্নেহশালী ;—কিন্তু রমণ বাবুর মত, এখনকার ছেলেদের মত, "উচ্চ শিক্ষায়" শিক্ষিত নহেন। তিনি ঠাকুর দেবতা খুব মানিতেন। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, ভূত প্রেত, ডাকিনী যোগিনী, যোগী মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমার দ্বারা যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ে স্মরণ হইল ; যাহাকে আমার অসাধারণ বুদ্ধি বলিতেন, তাহাও স্মরণ হইল ; যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও স্মরণ হইল। অতএব আমি যে বলিলাম, আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল। তিনি কিছু কাল স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তার পর নিজ বুদ্ধিবলে, সে বিশ্বাসটুকু দূর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কেমন মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি ?"

আমি। জিজ্ঞাসা কর।

তিনি। আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা, জান। তার বাপের নাম কি ?

আমি। হরমোহন দত্ত।

তিনি। তাঁর বাড়ী কোথায় ?

আমি। মহেশপুর।

তিনি। তুমি কে !!!

আমি। তা ত বলিয়াছি যে, পরে বলিব। মানুষ নই।

তিনি। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার বাপের বাড়ী কালাদীঘি। কালাদীঘির লোক, এ সকল জানিলে জানিতে পারে। এইবার বল—হরমোহন দত্তের বাড়ীর সদর দরওয়াজা কোন্ মুখ ?

আমি। দক্ষিণমুখ। একটা বড় ফটকে দুই পাশে দুইটা সিংহী।

তিনি। তাঁর কয় ছেলে ?

আমি। এক।

তিনি। নাম কি ?

আমি। বসন্তকুমার।

তিনি। তার কয় ভগিনী ?

আমি। আপনার বিবাহের সময় দুইটি ছিল।

তিনি। নাম কি ?

আমি। ইন্দিরা আর কামিনী।

তিনি। তাঁর বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে ?

আমি। আছে। নাম দেবীদীঘি। তাতে খুব পদ্ম ফুটে।

তিনি। হাঁ, তা দেখিয়াছিলাম। তুমি কখন মহেশপুরে ছিলে ? তার বিচিত্র কি ? তাই এত জান। আর গোটা কতক কথা বল দেখি। ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয় ?

আমি। পূজার দালানের উত্তরপশ্চিম কোণে।

তিনি। কে সম্প্রদান করে ?

আমি। ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহন দত্ত।

তিনি। স্ত্রী আচারকালে এক জন আমার বড় জোরে কাণ মুলিয়া দিয়াছিল। তার নাম আমার মনে আছে। বল দেখি তার নাম ?

আমি। বিন্দু ঠাকুরাণী—বড় বড় চোখ, রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট। নাকে ফাঁদি নথ।

তিনি। ঠিক। বোধ হয়, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। তাদের কুটুম্ব নও ত ?

আমি। কুটুম্বের মেয়ে, চাকরাণী, কি রাঁধুনীর মেয়ের জানা সম্ভব নয়, এমন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না।

তিনি। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল ?

আমি। —সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

তিনি চুপ করিয়া ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "আমায় অভয় দাও, আমি আর দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

আমি। অভয় দিতেছি। বল।

তিনি। বাসরঘরে সকলে উঠিয়া গেলে, আমি ইন্দিরাকে নির্জ্জনে একটি কথা বলিয়াছিলাম, সে তাহার উত্তর দিয়াছিল। কি কথা সে, বল দেখি ?

বলিতে আমার একটু বিলম্ব হইল। কারণ, সে কথাটা মনে করিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছিল, আমি তাহা সামলাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "এইবার বোধ হয় ঠকিলে! বাঁচিলাম—তুমি মায়াবিনী নয়।" আমি চক্ষের জল চক্ষের ভিতর ফেরত দিয়া বলিলাম, "তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'বল দেখি, আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হইল ?' ইন্দিরা বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার দেবতা হইলে, আমি তোমার দাসী হইলাম।' এই ত গেল একটা প্রশ্ন। আর একটা কি ?"

তিনি। আর জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিতেছে। আমি বুঝি বুদ্ধি হারাইলাম। তবু বল। ফুলশয্যার দিন ইন্দিরা তামাসা করিয়া আমাকে গালি দিয়াছিল, আমিও তার কিছু সাজা দিয়াছিলাম। বল দেখি, সে কথাগুলি কি ?

আমি। তুমি ইন্দিরার হাত এক হাতে ধরিয়া, আর হাত তার কাঁধে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'ইন্দিরে, বল দেখি, আমি তোমার কে ?' তাতে ইন্দিরা উত্তর করিয়াছিল, 'শুনিয়াছি, তুমি আমার ননদের বর।' তুমি দণ্ডস্বরূপ তার গালে একটা ঠোনা মারিয়া, তাকে একটু অপ্রতিভ দেখিয়া পরিশেষে মুখচুম্বন করিয়াছিলে। বলিতে বলিতে আমার শরীর অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইল—সেই আমার জীবনের প্রথম মুখচুম্বন। তার পর সুভাষিণীকৃত সেই সুধাবৃষ্টি। ইহার মধ্যে ঘোরতর অনাবৃষ্টি গিয়াছে। হৃদয় শুকাইয়া মাঠ ফাটা হইয়াছিল।

এই কথা ভাবিতেছিলাম, দেখিলাম, স্বামী, ধীরে ধীরে, বালিসের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিলেন। আমি বলিলাম, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

তিনি বলিলেন, "না। হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরী

দেখিলাম, এক্ষণে অনায়াসে আত্মপরিচয় দিতে পারি। আমার স্বামীর নিজ মুখ হইতে আমার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে, আমি পরিচয় দিব না, স্থির করিয়াছিলাম। তাই বলিলাম, "এখন আত্মপরিচয় দিব। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি

আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে থাকি। লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে, কিন্তু আমরা ডাকিনী নই। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই জন্য অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া এই মানবীরূপ ধারণ করিয়াছি। পাচিকাবৃত্তি এবং কুলটা-বৃত্তিও ভগবতীর শাপের ভিতর। তাই এ সকলও অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মহাভৈরবীদর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব।”

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কোথায়?”

আমি বলিলাম, “মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে, তোমার শ্বশুরবাড়ীর উত্তরে। সে তাঁদেরই ঠাকুরবাড়ী, বাড়ীর গায়ে, খিড়কি দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। চল, মহেশপুরে যাই।”

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, “তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে। কুমুদিনী যদি ইন্দিরা, তাহা হইলে কি সুখ! পৃথিবীতে তাহা হইলে আমার মত সুখী কে?”

আমি। যেই হই, মহেশপুর গেলেই সব গোল মিটিবে।

তিনি। তবে চল, কাল এখান হইতে যাত্রা করি। আমি তোমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া মহেশপুরে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে আপাততঃ বাড়ী যাইব। দুই একদিন সেখানে থাকিয়া আমি মহেশপুর যাইব। যোড়হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি যে, তুমি ইন্দিরাই হও, আর কুমুদিনীই হও, আর বিদ্যাধরী হও, আমাকে ত্যাগ করিও না।

আমি। না। আমার শাপান্ত হইলেও দেবীর কৃপায় আবার তোমায় পাইতে পারিব। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু।

“এ কথাটা ত ডাকিনীর মত নহে।” এই বলিয়া তিনি সদরে গেলেন। সেখানে লোক আসিয়াছিল। লোক আর কেহ নহে, রমণ বাবু। রমণ বাবু আমার স্বামীর সঙ্গে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে সীল-করা পুলিন্দা দিয়া গেলেন। আমার স্বামীকে সে সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ দিলেন। শেষ বলিলেন, “সুভাষিণীকে কি বলিব?”

আমি বলিলাম, “বলিবেন, কাল আমি মহেশপুর যাইব। গেলেই আমি শাপ হইতে মুক্ত হইব।”

স্বামী বলিলেন, “আপনাদের এ সব জানা আছে না কি?”

চতুর রমণ বাবু বলিলেন, “আমি সব জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী সুভাষিণী সব জানেন।”

বাহিরে আসিয়া স্বামী মহাশয় রমণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ডাকিনী যোগিনী বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন?”

রমণ বাবু রহস্যখানা কতক বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, “করি। সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী।”

স্বামী বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমণ বাবু আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া দিয়া নিজালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এস্থানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

সময়ান্তরে স্থূল কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু সব কথা নহে। এতটুকু বুঝিতে দিলাম যে, পরিশেষে আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম এবং স্বামীর নিকট হইতেই আসিয়াছি। এবং তিনিও দুই একদিনের মধ্যে এখানে আসিবেন। সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম। কামিনী আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। বড় রঙ্গ ভালবাসে। সে বলিল, "দিদি! যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?" আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।" তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম। সকলকে শিখাইয়া ঠিক করিলাম। বাপ মাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই। সেটা এইখানে হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব। তবে আমি যে এখানে আসিয়াছি, এই কথাটা তাঁহারা, জামাতা আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন।

পরদিন, সে জামাতা আসিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-অপেক্ষা করিলেন। আমি আসিয়াছি, এ কথা বাহিরে কাহারও মুখে তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যখন অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন, তখন বড় বিষণ্ণবদন।

জলযোগের সময়, আমি সম্মুখে রহিলাম না। কামিনী বসিল, আর দুই চারি জন জ্ঞাতি ভগিনী ভাইজ বসিল। তখন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিল ; তিনি যেন কলে উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি কোথায় ?"

কামিনী খুব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি কোথায় ? কালাদীঘিতে সেই যে সর্ব্বনাশটা হইয়া গেল, তার পর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।"

তাঁর মুখখানা বড় লম্বা হইয়া গেল। কথা আর কহিতে পারেন না। বুঝি কুমুদিনীকে হারাইলাম, এ কথা মনে করিয়া থাকিবেন ; কেন না, তাঁর চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

চক্ষের জল সামলাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদিনী বলিয়া, কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি ?"

কামিনী বলিল, "কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে পারি না, একটা স্ত্রীলোক পরশু দিন পাল্কী করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল।"

প্রাণনাথ জলযোগ ত্যাগ করিলেন। হাত ধুইয়া মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন ; অনেকক্ষণের পর বলিলেন, "যে স্থান হইতে কুমুদিনী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না ?"

কামিনী বলিল, "পাও বৈ কি ? অন্ধকার হয়েছে—আলো নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগে তুই যা। তার পর আলো নিয়ে উপেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইব।" আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম।

সেইখানে আলো ধরিয়া (খিড়কী দিয়া পথ আছে বলিয়াছি) কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া আমার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, "কুমুদিনী, কুমুদিনী ! যদি আসিয়াছ—ত আর আমায় ত্যাগ করিও না।"

তিনি বার দুই চারি এই কথা বলার পর, কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি ! উঠে আয় ! ও মিন্‌সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।"

তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি ! দিদি কে ?"

কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোন নি ?"

এই বলিয়া দুষ্টা কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। আমরা খুব ছুটিয়া আসিলাম। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেই আমাদের পিছু পিছু

ছুটিলেন। কিন্তু অন্ধকার—পথ অচেনা ; একটা চৌকাট বাধিয়া একটা ছোট রকম আছাড় খাইলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম, দুই জনে দুই দিক্ হইতে হাত ধরিয়া তুলিলাম। কামিনী চুপি চুপি বলিল, "আমরা বিদ্যাধরী—তোমার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি।"

এই বলিয়া, তাঁকে টানিয়া আনিয়া আমার শয্যাগৃহে উপস্থিত করিলাম। সেখানে আলো ছিল । তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এ কি ? এ ত কামিনী, আর এ ত কুমুদিনী।" কামিনী রাগে দশখানা হইয়া বলিল, "আঃ পোড়া কপাল ! এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করেছ ? কোদাল পাড় নাকি ? এ কুমুদিনী না,—ইন্দিরে—ইন্দিরে—ইন্দিরে !!! তোমার পরিবার ! আপনার পরিবার চিনতে পার না ?"

তখন স্বামী মহাশয় আহ্লাদে অজ্ঞান হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইতে গিয়া কামিনীকেই কোলে টানিয়া লইলেন। সে তাঁর গালে এক চড় মারিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সে দিনের আহ্লাদের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব উৎসব বাধিল। সেই রাত্রে কামিনীতে আর উ-বাবুতে প্রায় এক শত বার বাগ্‌যুদ্ধ হইল। সকল বারই প্রাণনাথ হারিলেন।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সেকালে যেমন ছিল

কালাদীঘির ডাকাইতির পর আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্বামী মহাশয় এক্ষণে আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণ বাবু ও সুভাষিণী যেরূপ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাও শুনিলেন। একটু রাগও করিলেন। বলিলেন, "আমাকে এত ঘুরাইবার ফিরাইবার প্রয়োজনটা কি ছিল ?" প্রয়োজনটা কি ছিল, তাহাও বুঝাইলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কামিনী সন্তুষ্ট হইল না। কামিনী বলিল, "তোমায় ঘানিগাছে ঘুরায় নাই, অমনি ছাড়িয়াছে, এইটুকু দিদির দোষ। আবার আব্‌দার নিলেন কি না, গ্রহণ করব না ! আরে মিন্‌সে, যখন আমাদের আল্‌তা-পরা শ্রীপাদপদ্মখানি ভিন্ন তোমার জেতের গতিমুক্তি নাই, তখন অত বড়াই কেন ?"

উ-বাবু এবার একটা উতোর মারিলেন, বলিলেন, "তখন চিনিতে পারি নে যে ! তোমাদের কি চিনতে জোওয়ায় ?"

কামিনী বলিল, "তুমি যে চিনিবে, বিধাতা তা কপালে লিখেন নাই। যাত্রায় শোন নি ? বলে,

ধবলী বলিল শ্যাম, কে চেনে তোমারে !
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে ॥
পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কাণে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি তা জানে ?

আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। উ-বাবু অপ্রতিভ হইয়া কামিনীকে বলিলেন, "যা ভাই, আর জ্বালাস্ নে ! যাত্রা করলি, তার জন্য এই পানের খিলিটা প্যালা নিয়ে যা।"

কামিনী বলিল, "ও দিদি ! মিত্রজার একটু বুদ্ধিও আছে দেখিতে পাই।"

আমি। কি বুদ্ধি দেখিলি ?

কামিনী। বাবু পানের ঠিলিটা রেখে খিলিটা দিয়েছেন, বুদ্ধি নয় ? তা তুই এক কাজ করিস ; মধ্যে মধ্যে তোর পায়ে হাত দিতে দিস্,—তা হলে হাত দরাজ হবে।

আমি। আমি কি ওঁকে পায়ে হাত দিতে, দিতে পারি ? উনি হলেন আমার পতিদেবতা।

কামিনী। দেবতা কবে হলেন ? পতি যদি দেবতা, তবে এত দিন ত তোমার কাছে উনি উপদেবতাই ছিলেন।

আমি। দেবতা হয়েছেন, যবে ওঁর বিদ্যাধরী গিয়েছে।

কামিনী। আহা, বিদ্যাকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারলেন না ! তা দেখ মিত্র মহাশয়, তোমার যে বিদ্যা, তাহার সঙ্গে ধরাধরি না থাকিলেই ভাল। সে বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

আমি। কামিনী, তুই বড় বাড়ালি ! শেষ চুরি চামারি পর্য্যন্ত ঘাড়ে ফেলিতেছিস্ ?

কামিনী। অপরাধ আমার ? যখন মিত্র মহাশয় কমিসেরিয়েটের কাজ করেছেন, তখন চুরি ত করেছেন। আর চামারি ;—তা যখন রসদ যুগিয়েছেন, তখন চামারিও করেছেন।

উ-বাবু বলিলেন, "বলুক গে ছেলেমানুষ। অমৃতং বালভাষিতং।"

কামিনী। কাজেই। তুমি যখন বিদ্যাধরী শাসিতং, তখন তোমার বুদ্ধি নাশিতং। আমি তবে আসিতং—মা ডাকিতং।

বাস্তবিক মা ডাকিতেছিলেন।

কামিনী মার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জান, কেন মা ডাকিতং ? তোমরা আর দুদিন থাকিতং—যদি না থাকিতং, তবে জোর ক'রে রাখিতং।"

আমরা পরস্পরের মুখ পানে চাহিলাম।

কামিনী বলিল, "কেন পরস্পর তাকিতং ?"

১০

উ-বাবু বলিলেন, "ভাবিতং।"

কামিনী বলিল, "বাড়ী গিয়া ভাবিতং। এখন দুই দিন এখানে খাবিতং, দাবিতং, হাসিতং, খুসিতং, খেলিতং, ধুলিতং, হেলিতং, দুলিতং, নাচিতং, গায়িতং—"

উ-বাবু বলিলেন, "কামিনী, তুই নাচবি ?"

কামিনী। দূর, আমি কেন ? আমি যে শিকল কিনে রেখেছি—তুমি নাচবে।

উ-বাবু। আমাকে ত আসা পর্য্যন্ত নাচাচ্ছ; আর কত নাচাবে—আজ তুমি একটু নাচবে।

কামিনী। তা হলে থাকিবে ?

উ-বাবু। থাকিব।

কামিনীর নাচ দেখিবার প্রত্যাশায় নহে, আমার পিতা মাতার অনুরোধে উ-বাবু আর এক দিন থাকিতে সম্মত হইলেন। সে দিনও বড় আনন্দে গেল। দলে দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া, সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া লইয়া মজলিস্ করিয়া বসিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজলিস্ হইল।

কত মেয়ে আসিল, তার সংখ্যা নাই। কত বড় বড় পটোল-চেরা ভ্রমর-তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, স্বচ্ছ সরোবরে সফরীর মত খেলিতে লাগিল; কত কালো কালো কুণ্ডলীকরা ফণাধরা অলকারাশি বর্ষাকালে বনের লতার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, দুলিয়া উঠিতে লাগিল,—যেন কালিয়দমনে কালনাগিনীর দল, বিত্রস্ত হইয়া যমুনার জলে ঘুরিতে ফিরিতেছে—কত কাণ, কাণবালা, চৌদান, মাকড়ি, ঝুমকা, ইয়ার্‌রিং, দুল—মেঘ-মধ্যে বিদ্যুতের মত, কত মেঘের মত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল,—কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে কত সুগন্ধি-তাম্বুল চর্ব্বণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল;—কত প্রৌঢ়ার ফাঁদিনথের ফাঁদে কন্দর্পঠাকুর ধরা পড়িয়া, তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন—কত অলঙ্কাররাশিভূষিত সুগোল বাহুর উৎক্ষেপনিক্ষেপে বায়ুসন্তাড়িত পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্যানের মত সেই কক্ষ একটা অলৌকিক চঞ্চল শোভায় শোভিত হইতে লাগিল, রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু শিঞ্জিতে ভ্রমরগুঞ্জন অনুকৃত হইতে লাগিল; কত চিকে চিক্ চিক্; হারে বাহার; চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার; মলের ঝলমলে চরণ টল্‌মল্! কত বানারসী, বালুচরী, মৃজাপুরী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা,—চেলি, গরদ, সূতা,—রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে, ফুর্‌ফুরে, ঝুর্‌ঝুরে, বাঁহরে—তাতে কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোমটা, কারও আধঘোমটা,—কারও কেবল কবরীপ্রান্তে মাত্র বসনসংস্পর্শ—কারও তাতেও ভুল। আমার প্রাণনাথ অনেক গোরার পল্টন ফতে করিয়া ঘরে টাকা লইয়া আসিয়াছেন—অনেক কর্ণেল, জান্‌রেলের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া, লাভের অংশ

ঘরে লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এই সুন্দরীর পল্টন দেখিয়া, তিনি বিশুষ্ক—বিত্রস্ত। তোপের আগুনের স্থানে নয়নবহ্নির স্ফূর্ত্তি-কামানের কালকরালকুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জের পরিবর্ত্তে এই কালকরালকুণ্ডলীকৃত কমনীয় কেশকাদম্বিনী, বেওনেটের ঠন্‌ঠনির পরিবর্ত্তে এই অলঙ্কারের রুণ্‌রুণি ; জয়ঢাকের বাদ্যের পরিবর্ত্তে আলতা-পরা পায়ে মলের ঝম্‌ঝমি ! যে পুরুষ চিলিয়ানওয়ালা দেখিয়াছে—সেও হতাশ্বাস। এ ঘোর রণক্ষেত্রে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি আমাকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে ডাকিলেন—কিন্তু আমিও শিখ সেনাপতির মত, বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম—এ রণে তাঁহার সাহায্য করিলাম না।

স্থূল কথা, এই সকল মজলিস্‌গুলায় অনেক নির্ল্লজ্জ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে জানিতাম। তাই কামিনী আর আমি গেলাম না—বাহিরে রহিলাম। দ্বার হইতে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলাম। যদি বল, যাহাতে নির্ল্লজ্জ ব্যাপার ঘটে, তুমি তাহার বর্ণনায় কেন প্রবৃত্ত, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, আমি হিন্দুর মেয়ে, আমার রুচিতে এই সকল ব্যাপার নির্ল্লজ্জ ব্যাপার। কিন্তু এখনকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি ; ইংরেজি রুচির বিধানমতে বিচার করিলে ইহাতে নির্ল্লজ্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়া যাইবে না।

বলিয়াছি, আমি ও কামিনী দুই জনে একবার একবার উঁকি মারিলাম। দেখি, পাড়ার যমুনাঠাকুরাণী সভাপত্নী হইয়া জমকাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইয়াছে ; রঙটা মিঠে রকম কালো ; চোক দুইটা ছোট ছোট, কিন্তু একটু ঢুলু ঢুলু, ঠোঁট দুইখানা পুরু, কিন্তু রসে ভরা ভরা। বস্ত্রালঙ্কারের বাহার—পায়ে আলতার বাহার, কালোতে রাঙ্গা, যেন যমুনাতেই জবা,—মাথায় ছেঁড়া চুলের বাহার। শরীরের ব্যাস ও পরিধি অসাধারণ দেখিয়া, আমার স্বামী তাঁহাকে "নদীরূপা মহিষী" বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। মথুরাবাসীরা যমুনা নদীকে কৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী বলিয়া থাকে, সেই কথা লক্ষ্য করিয়া উ-বাবু এই রসিকতা করিলেন। এখন আমার যমুনা দিদি কখনও মথুরা যান নাই, এত খবরও জানেন না, এবং মহিষী শব্দের অর্থটা জানেন না। তিনি মহিষী অর্থে কেবল মাদি মহিষই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্তুর সহিত আপনার শরীরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন। প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে প্রকারান্তরে "গাই" বলিলেন, এমন সময়ে আমি দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যমুনা দিদি ! কি গা ?"

যমুনা দিদি বলিলেন, "একটা গাই ভাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাই কেন গা ?"

কামিনী আমার পাশ হইতে বলিল, "ডেকে ডেকে যমুনা দিদির গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে। একবার পিওবে।"

হাসির চোটে সভাপত্নী মহাশয়া নিবিয়া গেলেন, কামিনীর উপর গরম হইয়া বলিলেন, "একরত্তি মেয়ে, তুই সকল হাঁড়িতে কাটি দিস্ কেন্ লো কামিনি ?"

কামিনী বলিল, "আর ত কেউ তোমার ভুসি কলাই সিদ্ধ করিতে জানে না।"

এই বলিয়া কামিনী পলাইল, আমিও পলাইলাম। আবার একবার গিয়া উঁকি মারিলাম, দেখি, পাড়ার পিয়ারী ঠান্‌দিদি, জাতিতে বৈদ্য—বয়স পঞ্চষষ্টি বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে—তিনি সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া, রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন। আমার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ কৈ ? কৃষ্ণ কৈ ? বলিয়া সেই কামিনীকুঞ্জবন পরিভ্রমণ করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খোঁজ ঠান্‌দিদি ?'

তিনি বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকে খুঁজি।"

কামিনী বলিল, "গোয়ালাবাড়ী যাও—এ কায়েতের বাড়ী।"

রসিকতাপ্রবীণা বলিল, "কায়েতের বাড়ীই আমার কৃষ্ণ মিলিবে।"

কামিনী বলিল, "ঠান্‌দিদি, সকল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি ?"

এখন পিয়ারী ঠাকুরাণীর এককালে তেলি অপবাদ ছিল। এই কথায়, তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁকে থামাইবার জন্য, যমুনা দিদিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "রাগ কর কেন ? তোমার কৃষ্ণ ঐ যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এসো—তোমায় আমায় পুলিনে দাঁড়াইয়া একটু কাঁদি।"

যমুনা ঠাকুরাণী "মহিষী" শব্দের অর্থবোধে যেমন পণ্ডিতা, "পুলিন" শব্দের অর্থবোধেও সেইরূপ। তিনি ভাবিলেন, আমি বুঝি কোন পুলিনবিহারীর কথার ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার অকলঙ্কিত সতীত্বের—(অকলঙ্কিত তাঁহার রূপের প্রভাবে)—প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছি। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "এর ভিতর পুলিন কে লো ?"

কাজেই আমারও একটু রঙ্গ চড়াইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, "যার গায়ে পড়িয়া যমুনা রাত্রিদিন তরঙ্গভঙ্গ করে, বৃন্দাবনে তাকে পুলিন বলে।"

আবার তরঙ্গভঙ্গে সর্ব্বনাশ করিল,—যমুনা দিদি ত কিছু বুঝিল না, রাগিয়া বলিল, "তোর তরঙ্গ ফরঙ্গকেও চিনি নে, তোর পুলিনকেও চিনি নে, তোর বেন্দাবনকে চিনি নে। তুই বুঝি ডাকাতের কাছে এত সব রঙ্গরসের নাম শিখে এসেছিস্ ?"

মজলিসের ভিতর রঙ্গময়ী বলিয়া আমার একজন সমবয়স্কা ছিল। সে বলিল, "অত ক্ষেপ কেন যমুনা দিদি ! পুলিন বলে নদীর ধারের চড়াকে। তোমার দু ধারে কি চড়া আছে ?"

চঞ্চলা নামে যমুনা দিদির ভাইজ, ঘোমটা দিয়া পিছনে বসিয়াছিল, সে ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "চড়া থাকিলেও বাঁচিতাম! একটু ফরসা কিছু দেখিতে পাইতাম। এখন কেবল কালো জলের কালিন্দী কল্ কল্ করিতেছে।"

কামিনী বলিল, "আমার যমুনা দিদিকে কেন তোরা অমন ক'রে চড়ার মাঝখানে ফেলে দিতেছিস্!"

চঞ্চলা বলিল, "বালাই! ষাট্! ঠাকুরঝিকে চড়ার মাঝখানে ফেলে দেব কেন? ওঁর ভাইয়ের পায়ে ধ'রে বলব, যেন ঠাকুরঝিকে মেঠো শ্মশানে দেন।"

রঙ্গময়ী বলিল, "দুটোতে তফাৎ কি বৌ?"

চঞ্চলা বলিল, "শ্মশানে শিয়াল কুকুরের উপকার;—চড়ায় গোরু মহিষ চরে—তাদের কি উপকার?" মহিষ কথাটা বলিবার সময়ে, বৌ একবার ঘোমটা তুলিয়া ননদের উপর সহাস্যে কটাক্ষ করিল।

যমুনা বলিল, "নে, আর এক-শ বার সেই কথা ভাল লাগে না। যাদের মোষ ভাল লাগে, তারাই এক-শ বার মোষ মোষ করুক গে।"

পিয়ারী ঠান্‌দিদি কথাটায় বড় কান দেন নাই—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোষের কথা কি গা?"

কামিনী বলিল, "কোন্ দেশে তেলিদের বাড়ী মোষে ঘানি টানে, সেই কথা হ'চ্ছে।"

এই বলিয়া কামিনী পলাইল। বার বার সেই তেলি কথাটা মনে করিয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই—কিন্তু কামিনী কুচরিত্রা লোক দেখিতে পারিত না। পিয়ারী ঠান্‌দিদি, রাগে অন্ধকার দেখিয়া আর কথা না কহিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া বসিল। আমি তখন কামিনীকে ডাকিয়া বলিলাম, "কামিনী! দেখ্ সে আয় লো! এইবার পিয়ারী কৃষ্ণ পেয়েছেন।"

কামিনী দূর হইতেই বলিল, "অনেক দিন সময় হয়েছে।"

তার পর একটা সোর গোল শুনিলাম। আমার স্বামীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—তিনি একজনকে হিন্দিতে ধমক ধামক করিতেছেন। আমরা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, এক জন দাড়িওয়ালা মোগল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; উ-বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমক ধামক করিতেছেন, মোগল যাইতেছে না। কামিনী তখন দ্বার হইতে ডাকিয়া বলিল, "মিত্র মহাশয়! গায়ে কি জোর নেই?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আছে বৈ কি?"

কামিনী বলিল, "তবে মোগল মিন্‌সেকে গলা ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দাও না।"

এই বলিবা মাত্র মোগল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পলায়ন করিবার সময় আমি তাহার দাড়ি ধরিলাম—পরচুলা খসিয়া আসিল। মোগল বলিল, "মরণ আর কি! তা এ

বোকাটি নিয়া ঘর করিবি কি প্রকারে?" এই বলিয়া সে পলাইল। আমি দাড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যমুনা দিদিকে উপহার দিলাম। উ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

কামিনী বলিল, "ব্যাপার আর কি? তুমিই দাড়িটা পরিয়া চারি পায়ে ঘাসবনে চরিতে আরম্ভ কর।"

উ-বাবু বলিলেন, "কেন, মোগল কি জাল?"

কামিনী। কার সাধ্য এমন কথা বলে! শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী কি জাল মোগল হইতে পারে! আসল দিল্লীর আমদানি।

একটা ভারি হাসি পড়িয়া গেল। আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে পাড়ার ব্রজসুন্দরী দাসী একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া একটি ছেলে কোলে করিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া তুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। "আমি বড় গরীব; খেতে পাই না; ছেলেটি মানুষ করিতে পারি না।" উ-বাবু তাহাকে কিছু দিলেন। আমরা তুই জনে দ্বারের তুই পাশে। সে যখন দ্বার পার হয়, কামিনী তাহাকে বলিল, "ভাই ভিখারিণী! জান ত বড় মানুষের কাছে কিছু ভিক্ষা পাইলে দ্বারবান্‌দের কিছু ঘুস দিয়ে যেতে হয়?"

ব্রজসুন্দরী বলিল, "দ্বারবান্ কে?"

কামিনী। আমরা তুই জন।

ব্রজ। কত ভাগ চাও?

কামিনী। পেয়েছ কি?

ব্রজ। দশটি টাকা।

কা। তবে, আমাদের আট টাকা আট টাকা ষোল টাকা দিয়া যাও।

ব্রজ। লাভ মন্দ নয়!

কা। তা বড় মানুষের বাড়ীর ভিক্ষায় লাভালাভ ধরিতে গেলে চলিবে কেন? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও কিছু দিতে হয়।

ব্রজসুন্দরী বড় মানুষের স্ত্রী। ধাঁ করিয়া ষোল টাকা বাহির করিয়া দিল। আমরা সেই ষোল টাকা যমুনা ঠাকুরাণীকে দিলাম, বলিলাম, "তোমরা এই টাকায় সন্দেশ খাইও।"

স্বামী বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ততক্ষণে ব্রজসুন্দরী ছেলে পাঠাইয়া দিয়া, বানারসী পরিয়া আসিয়া বসিলেন। আবার একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

উ-বাবু বলিলেন, "এ কি যাত্রা নাকি?"

যমুনা বলিল, "তা না ত কি? দেখিতেছ না, কাহারও কালিয়দমনের পালা, কারও কলঙ্কভঞ্জনের পালা, কারও মাথুর মিলন,—কারও শুধু পালাই পালাই পালা।"

উ-বাবু। শুধু পালাই পালাই পালা কার ?

যমুনা। কেন কামিনীর! কেবল পালাই পালাই তার পালা।

কামিনী কথায় সকলকে জ্বালাইতে লাগিল ; পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়া সকলকে তুষ্ট করিতেছিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিল, বলিল, "তুই যে বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ লা ?"

কামিনী বলিল, "পালাব না ত কি তোমাদের ভয় করি না কি ?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কামিনী ! ভাই, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল ?"

কামিনী। কি কথা ছিল, মিত্র মহাশয় ?

উ-বাবু। তুমি নাচিবে।

কা। আমি ত নেচেছি।

উ। কখন নাচলে ?

কা। দুপুর বেলা।

উ। কোথায় নাচলি লো ?

কা। আমার ঘরের ভিতর, দোর বন্ধ ক'রে।

উ। কে দেখেছে ?

কা। কেউ না।

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না।

কা। এমন কথাও ছিল না যে, তোমাদের সম্মুখে আসিয়া পেশওয়াজ পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার করিয়াছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথা রাখিয়াছি। তোমরা দেখিতে পাইলে না, তোমাদের অদৃষ্টের দোষ। এখন আমি যে শিকল কিনিয়া রাখিয়াছি, তার কি হবে ?

কামিনী যদি নাচের দায়ে এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধরা পড়িলেন। মজলিস্ হইতে হুকুম হইল তোমাকে গায়িতে হইবে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন তিনি সনদী খিয়াল গায়িলেন। শুনিয়া সে অপ্সরোমণ্ডলী হাসিল। ফরমায়েস করিল, 'বদন অধিকারী, কি দাশু রায়।" তাতে উ-বাবু অপটু। সুতরাং অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইল না।

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি কাটিল। এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায়, এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি

লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাঁহারা জামাই দেখিতে পৌরস্ত্রীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাঁহাদের চোখ কান ফুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাই ধরি মাছ, না ছুঁই পানি করিয়া, তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমি পরদিন স্বামীর সঙ্গে শিবিকারোহণে শ্বশুরবাড়ী গেলাম। স্বামীর সঙ্গে যাইতেছি, সে একটা সুখ বটে, কিন্তু সে বার যে যাইতেছিলাম, সে আর এক প্রকারের সুখ। যাহা কখন পাই নাই, তাই পাইবার আশায় যাইতেছিলাম; এখন যাহা পাইয়াছিলাম, তাই আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। একটা কবির কাব্য, অপরটা ধনীর ধন। ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি? যাহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া বুড়া হইয়াছে, কাব্য হারাইয়াছে, তাহারাও এ কথা বলে না। তাহারা বলে, ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটে, ততক্ষণই সুন্দর; তুলিলে আর তেমন সুন্দর থাকে না। স্বপ্ন যেমন সুখের, স্বপ্নের সফলতা কি তত সুখের হয়? আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র, ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি। কাব্যই সুখ। কেন না, কাব্য আশা, ধন ভোগমাত্র। তাও সকলের কপালে নয়। অনেক ধনী লোক কেবল ধনাগারের প্রহরী মাত্র। আমার একজন কুটুম্ব বলেন, "ত্রেজুরি গার্ড।"

তবু সুখে সুখেই শ্বশুরবাড়ী চলিলাম। সেখানে, এবার নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলাম। স্বামী মহাশয়, মাতাপিতার সমীপে সমস্ত কথা সবিশেষে নিবেদন করিলেন। রমণ বাবুর পুলিন্দা খোলা হইল। তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কথা মিলিল। আমার শ্বশুর শাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন। সমাজের লোকেও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কোন কথা তুলিল না।

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া, সুভাষিণীকে পত্র লিখিলাম। সুভাষিণীর জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার স্বামী আমার অনুরোধে রমণ বাবুর নিকট হারাণীর জন্য পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শীঘ্রই সুভাষিণীর উত্তর পাইলাম। উত্তর আনন্দ-পরিপূর্ণ। সুভাষিণী, র-বাবুর হস্তাক্ষরে পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু কথাগুলা সুভাষিণীর নিজের, তাহা কথার রকমেই বুঝা গেল। সে সকলেরই সংবাদ লিখিয়াছিল। দুই একটা সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সে লিখিতেছে,

"হারাণী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। বলে, আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে। এটা যেন ভাল কাজই করিয়াছিলাম, কিন্তু এ রকম কাজ ত মন্দই হয়। আমি যদি লোভে পড়িয়া মন্দেই রাজি হই? আমি পোড়ারমুখীকে বুঝাইলাম যে, আমার ঝাঁটা না খাইলে

কি তুই এ কাজ করিতিস্ ? সবার বেলাই কি তুই আমার হাতের ঝাঁটা খেতে পাবি ? মন্দ কাজের বেলা কি আমি তোকে তেমনই তোর স্থধু মুখে ঝাঁটা খাওয়াইব ? ছুটো গালাগালিও খাবি না কি ? ভাল কাজ করেছিলি, বক্শিষ্ নে। এইরূপ অনেক বুঝান পড়ানতে সে টাকা নিয়াছে। এখন নানা রকম ব্রত নিয়ম করিবার ফর্দ্দ করিতেছে। যত দিন না তোমার এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তত দিন সে আর হাসে নাই, কিন্তু এখন তার হাসির জ্বালায় বাড়ীর লোক অস্থির হইয়াছে।"

পাচিকা ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীর সংবাদ স্থভাষিণী এইরূপ লিখিল, "যে অবধি তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে গোপনে চলিয়া গিয়াছ, সে অবধি বুড়ী বড় আস্ফালন করিত, বলিত, 'আমি বরাবর জানি, সে মানুষ ভাল নয়। তার রকম সকম ভাল নয়। কত বার বলেছি যে, এমন কুচরিত্র মানুষ তোমরা রেখ না। তা, কাঙ্গালের কথা কে গ্রাহ্য করে ? সবাই কুমুদিনী কুমুদিনী ক'রে অজ্ঞান।' এমনই এমনই আরও কথা। তার পর যখন শুনিল যে, তুমি আর কাহারও সঙ্গে যাও নাই, আপনার স্বামীর সঙ্গে গিয়াছ, তুমি বড় মানুষের মেয়ে, বড় মানুষের বৌ—এখন আপনার ঘর বর পাইয়াছ, তখন বলিল, 'আমি ত বরাবর বলচি মা যে, সে বড় ঘরের মেয়ে, ছোট ঘরে কি আর অমন স্বভাব চরিত্র হয় ? যেমন রূপ, তেমনই গুণ, যেন লক্ষ্মী ! সে ভাল থাকুক মা ! ভাল থাকুক ! তা, হা দেখ বৌদিদি ! আমাকে কিছু পাঠাইয়া দিতে বলো'।"

গৃহিণী সম্বন্ধে স্থভাষিণী লিখিল, "তিনি তোমার এই সকল সংবাদ পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে ও র-বাবুকে কিছু ভৎ র্সনাও করিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'সে যে এত বড় ঘরের মেয়ে, তা তোরা আমাকে আগে বলিস্ নে কেন ? আমি তাকে খুব যত্নে রাখিতাম।' আর, তোমার স্বামীরও কিছু নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'হোক্ তাঁর পরিবার, আমার অমন রাঁধুনীটা নিয়ে যাওয়া তাঁর কিছু ভাল হয় নাই'।"

কর্ত্তা রামরাম দত্তের কথা খোদ স্থভাষিণীর নিজ হাতের হিজিবিজি। কষ্টে পড়িলাম যে, কর্ত্তা গৃহিণীকে কৃত্রিম কোপের সহিত তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ছল ছুতা করিয়া সুন্দর রাঁধুনীটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ।" গৃহিণী বলিলেন, "খুব করিয়াছি, তুমি সুন্দরী নিয়ে কি ধুইয়া খাইতে ?" কর্ত্তা বলিলেন, "তা কি বলতে পারি। ও কালো রূপ আর রাত দিন ধ্যান করিতে পারা যায় না।" গৃহিণী সেই হইতে শয্যা লইলেন, আর সে দিন উঠিলেন না। কর্ত্তা যে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়াছেন, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না।

বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গের জন্য কিছু কিছু পাঠাইয়া দিলাম।

তার পর সুভাষিণীর সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তার কন্যার বিবাহের সময়ে বিশেষ অনুরোধে, স্বামী মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষিণীর কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইলাম—গৃহিণীকে উপযুক্ত উপহার দিলাম—যে যাহার যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ দান ও সম্ভাষণ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গৃহিণী আমার প্রতি ও আমার স্বামীর প্রতি অপ্রসন্ন। তাঁর ছেলের ভাল খাওয়া হয় না, কথাটা আমায় অনেক বার শুনাইলেন। আমিও রমণ বাবুকে কিছু রাঁধিয়া খাওয়াইলাম। কিন্তু আর কখন গেলাম না। রাঁধিবার ভয়ে নয়; গৃহিণীর মনোদুঃখের ভয়ে।

গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।

সম্পূর্ণ

পাঠভেদ

'ইন্দিরা'র প্রথম ও পঞ্চম সংস্করণে এত পার্থক্য যে, পাঠভেদ দেওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ পঞ্চম সংস্করণকে সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র "পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপনে"ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে 'ইন্দিরা' একটি বড় গল্প মাত্র (পৃষ্ঠা ৪৫) ছিল, আমরা "পাঠভেদে" সেইটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিলাম।—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না। বলিলেন, "বিহাইকে বলিও, যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?" শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারপ্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই-পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সম্বাদ লইলেন না। যে সময়ে আমার ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে তিনি বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট্ বটে ত?) কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন; হাল আইনে তাঁহাকে আমার "উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারি জন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ। হাসিয়া বলিলেন, "মা, ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

তাই আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয়

মহেশপুর ; উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ। সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে, জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, জল নীলমেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে একা লোক জন আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই জন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পঁহুছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা কিছু জল টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোক জন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি ক্ষণেক পরে, অনুভবে বুঝিলাম যে, লোক জন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে, এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সে স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারি পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণ-শোভিত "পাহাড়";—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী, পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপরে জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু২ তরঙ্গহিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যাম সলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দেখিলাম যে, বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুরবাড়ীর, একজন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিগের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য।

দেখিতে২ আর এক জন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল! দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপে চারি জন প্রায় এককালীনই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই—পাল্কী স্কন্ধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন হ্যায় রে! কোন হ্যায় রে" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়াইল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে! পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোকে অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। প্রথমে ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে বটের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুত বেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, এক জন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল, তখন এক জন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এই রূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া, পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া, পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্ন মাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়! সেই নিবিড় অরণ্যে, অন্ধকার রাত্রে, আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া, আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণ ভাবে বলিল, "বাছা! অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনি সোহরত হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

এক জন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দ্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়ী এইখানে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনা গেল—ততক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল। তার পর সেইখানে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশপত্রাবচ্ছেদে বালারুণকিরণ ভূমে পতিত হইয়াছে। আমি গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামানুসন্ধানে গেলাম। কিছু দূর গিয়া একখানি গ্রাম পাইলাম। আমার পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামের সন্ধান করিলাম; আমার শ্বশুরালয় যে গ্রামে, তাহারও সন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, আমি ইহার অপেক্ষা বনে ছিলাম ভাল। একে লজ্জায় মুখ ফুটিয়া পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পারি না, যদি কই, তবে সকলেই আমাকে যুবতী দেখিয়া আমার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষ করিতে থাকে। কেহ ব্যঙ্গ করে- কেহ অপমানসূচক কথা বলে। আমি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, "এইখানে মরি, সেও ভাল; তবু আর পুরুষের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।" স্ত্রীলোকেরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না—তাহারাও আমাকে জন্তু মনে করিতে লাগিল বোধ হয়, কেননা তাহারাও বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিল। কেবল এক জন প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা? তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে রাখিয়া আইস। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সে গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ। বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে দুই দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ২ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে?" আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ! ঐ রূপ, রূপ, শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে, দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গাত্রবেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে; বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গাত্রের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে

হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকেই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্রসন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি ইহা উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতিখুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে কলিকাতায় গেলে অবশ্য আমার খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সম্বাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে আমার জানাশুনা আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা। বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথিনী আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।" কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পর দিন নৌকায় উঠিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতার কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনি একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। একজন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতিখুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় একজন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। রামরাম দত্ত নামে আমার একজন আত্মীয় লোক ঠনঠনিয়ায় বাস করেন। কল্য তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে 'মহাশয় আমার পাচিকার অভাবে বড় কষ্ট

হইতেছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়ী রাঁধিয়া খায়। আমাকে একটি দিতে পারেন?' আমি বলিয়াছি, 'চেষ্টা দেখিব।' তুমি এ কার্য্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমত শক্তি নাই যে তোমায় আবার খরচপত্র করিয়া কাশী লইয়া যাই। আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে? বরং এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।"

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রিদিন "রূপ! রূপ!" শুনিয়া আমার কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষজাতি মাত্র আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রাম রাম বাবুর বয়স কত?"

উ। "তিনি আমার মত প্রাচীন।"

"তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান কি না?"

উ। "দুইটি।"

"অন্য পুরুষ তাঁহার বাড়ীতে কে থাকে?"

উ। "তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।"

আমি সম্মত হইলাম। পরদিন কৃষ্ণদাস বাবু আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ী পাচিকা হইয়া রহিলাম। শেষে কপালে এই ছিল! রাঁধিয়া খাইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমে মনে করিলাম, যে আমার বেতনের টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পিত্রালয়ে যাইতে পারিব। কিন্তু মহেশপুর কোথায়, কেহ চিনে না—এমন লোক পাইলাম না যে কোন সুযোগ করিয়া দেয়। মহেশপুর কোন জেলা, কোন দিগে যাইতে হয়, আমি কুলবধূ, এ সকলের কিছুই জানিতাম না, সুতরাং কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে এক বৎসর রামরাম বাবুর বাড়ীতে কাটিল। তাহার পর একদিন অকস্মাৎ এ অন্ধকার পথে প্রদীপের আলো পড়িল, মনে হইল। শ্রাবণের রাত্রে নক্ষত্র দেখিলাম, মনে হইল।

এই সময়ে রামরাম দত্ত আমাকে এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, "আজ একটি বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তিনি আমার মহাজন, আমি খাদক,—আজিকার পাক শাক যেন পরিপাটি হয়। নহিলে বড় প্রমাদ হইবে।"

আমি যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল—সুতরাং আমিই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইলাম। কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং রামরাম বাবু আহারে বসিলেন।

আমি অগ্রে অন্নব্যঞ্জন দিয়া আসিলাম—পরে তাঁহারা আসিলেন। তাহার পর মাংস দিতে গেলাম। আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি, আমি মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া

রহিলাম, আর একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। পুরুষে বলিয়া থাকেন, যে অন্ধকারে প্রদীপের মত অবগুণ্ঠন মধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদায় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু সুখী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্ত একটুকু সুখী হইয়া আসিলাম না। আমার নারীজন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতা মণ্ডলী আমার উপর ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "পাপিষ্ঠে, এ যে অনুরাগ।" আমি স্বীকার করিতেছি, এ অনুরাগ। কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

আমি স্বীকার করিতেছি যে এ কথা বলিয়া আমি দোষশূন্য হইতে পারিতেছি না। সকারণে হউক, আর নিষ্কারণেই হউক, পাপ সকল অবস্থাতেই পাপ। পাপের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাপ ও এই শেষ পাপ।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া, আমার যেন মনে হইল, আমি ইহাঁকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাঁকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমত সময়ে রামরাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন, যে পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ উনি রাঁধেন ভাল।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "তোমার মাতা আর মুণ্ড রাঁধি।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে আপনার বাড়ীতে দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি।" বস্তুতঃ দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজ দেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, "তা হবে; ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার যো পাইলেন, একেবারে আমার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

আমার প্রথম সমস্যা; কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, "আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল। এখন আর একটা বলিয়া দেখি।" এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম,

"আমাদের বাড়ী কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন,

"উপেন্দ্র বাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া এক বার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল ?" আমি মাংসের পাত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে এই ইতিবৃত্ত মধ্যে এক শত বার আমার স্বামীর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটিতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দেও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব ? এক শত বার "স্বামী স্বামী" করিয়া কান জালাইয়া দিব ? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব ? না "প্রাণনাথ" "প্রাণকান্ত" "প্রাণেশ্বর" "প্রাণপতি", এবং "প্রাণাধিকের" ছড়াছড়ি করিব ? যিনি আমাদিগের সর্ব্বপ্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে২ ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (সে একটু সহর ঘেঁসা মেয়ে) স্বামীকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মনে২ স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"

এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্ব্বাটীতে গমনকালে যে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে২ বলিলাম যে, "যদি ইনি এদিক্ ওদিক্ চাহিতে২ না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই।" আমি

স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রে২ রামরাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারি দিগে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবা মাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক,—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয় "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

হারাণী নামে রামরাম দত্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি! দিদি ঠাকুরুন! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ—আমার এ উপকার করবি কি না বল্।"

হারাণী বলিল, "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব, কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।"

হারাণীর নীতিশিক্ষা এইরূপ।

হারাণী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটা মাছের মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। চারি দণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি, যদি অপরাহ্ণে চলিয়া যান—তুই একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্ যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন।' কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোন ছল করিয়া থাকিবেন।" হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি!" কিন্তু দৌত্য স্বীকৃতা হইয়া গেল। হারাণী অপরাহ্ণে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা বলিয়াছি। বাবুটি ভাল মানুষ নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে২ তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমত কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে২ নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে২ সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে২ কলিকাতায় আসিতেন। রামরাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্ণে তিনি হারাণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া, রামরামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রামরাম বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজ পত্র সব আড়তে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতেই যাইব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রে সকলে আহারান্তে শয়ন করিলে পর, আমি নিঃশব্দে রামরাম দত্তের বৈঠকখানায় গেলাম। তথায় আমার স্বামী একাকী শয়ন করিয়াছিলেন।

যৌবন প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ—তবে কাঁদ কেন?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্ম্মপীড়া হইল, তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষের প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন—যদি মনে করেন যে, "ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্য লোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে"—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহাঁর বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমাদিগের দেশে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা এখনও আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব।" এই ছলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। না।

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড় লোক, এটি তেমনি বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এঁর পরে আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাঁধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমত বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই, বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না! আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথায় হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?"

তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয়! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রে আমি স্বামি-শয্যায় বসিয়া তাঁহার আনন্দিত মোহনমূর্ত্তি দেখিতে২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তখন সে চিন্তিতভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে তিনি আমার হাস্য কটাক্ষের বশীভূত হইয়াছেন। মনে২ করিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গ প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর শুণ্ড প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখ ব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহার প্রয়োগ করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার নিকটে আসিবেন না। আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি," হাসিতে২ আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে২ কবরী মোচনপূর্ব্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে?) আবার বাঁধিতে বসিলাম, "আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সম্বাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।"

বোধ হয়, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে২ বলিলাম, "তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ," এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ন হইলেন; আসিয়া আমার হস্ত ধরিলেন। আমি রাগ করিয়া হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম. বলিলাম, "তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না।"

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাত যোড় করিয়া ডাকিলেন, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই।" আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি কোন ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব? ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র প্রধান উপায়—একদিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আমি চলিলাম।"

তিনি বলিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই।" এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসিলাম। তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথ রোধ করিলেন।

তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্প দূর, সেই রাত্রেই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কিন্তু দেখি তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনি ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল

কথা বলিব। আমি যদি আগুন জালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রে এত আগুন জলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জালিলাম – কি প্রকারে ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি নাই। যদি আমার কোন পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবেই তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এইরূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীতে আগুন লাগিত।

এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনী, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিলাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। লজ্জার কথা কহিব কি?—এক দিন একটু কাঁদিলাম; কেন কাঁদিলাম, তাহা স্পষ্ট তাঁহাকে জানিতে দিলাম না—অথচ একটু২ বুঝিতে দিলাম যে অষ্টাহ পরে পাছে বিচ্ছেদ হয়—পাছে তাঁহার অনুরাগ স্থায়ী না হয়, এই আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। এক দিন, তাঁহার একটু অসুখ হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম। এ সকল পাপাচরণ শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তিনি যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগী, তাহার অধিক আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে তিনি অষ্টাহ পরে আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও আমি যাইতাম না।

ইহাও বলা বাহুল্য যে তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতি পদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিতমাত্রে স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার উন্মাদগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

পরীক্ষার শেষ দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিলাম। বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি তোমার সঙ্গে আসিয়া ভাল করি নাই। তোমাকে বৃথা কষ্ট দিলাম। এখন আমার বিবেচনা হইতেছে, পরীক্ষা মিথ্যা ভ্রম মাত্র। মানুষের মন স্থির নয়। তুমি আট দিন আমাকে ভাল বাসিলে—কিন্তু আট মাস পরে তোমার এ ভালবাসা থাকিবে কি না, তাহা তুমিও বলিতে পার না। তুমি আমায় ত্যাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার যদি সেই ভাবনা হয়, তবে আমি তোমাকে এখনই

যাবজ্জীবনের উপায় করিয়া দিতেছি। পূর্ব্বেই আমি মনে করিয়াছি, তোমার যাবজ্জীবনের সংস্থান করিয়া দিব।"

আমিও ঐ কথাই পাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তিনি আপনি পাড়ায় আরও ভাল হইল। আমি তখন বলিলাম, "ছি! তুমি যদি ত্যাগ করিলে তবে আমি টাকা লইয়া কি করিব? ভিক্ষা করিয়া খাইলেও জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তুমি ত্যাগ করিলে জীবন রক্ষা হইবে না। তুমি এমন কোন কাজ কর, যাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে তুমি এ জন্মে আমায় ত্যাগ করিবে না। আজ শেষ পরীক্ষার দিন।"

তিনি বলিলেন, "কি করিব, বল। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম, "আমি স্ত্রীলোক, কি বলিব? তুমি আপনি বুঝিয়া কর।" পরে অন্য কথা পাড়িলাম। কথায়২ একটা মিথ্যা গল্প করিলাম। তাহাতে কোন ব্যক্তি আপন উপপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল—এই প্রসঙ্গ ছিল।

তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গাড়ি প্রস্তুত হইলে কোথায় গেলেন। আট দিনের মধ্যে এই তিনি প্রথমে আমার কাছ ছাড়া হইলেন। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। অপরাহ্ণে আবার গেলেন। এবার একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ইহা লও। তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম। উকীলের বাড়ী হইতে এই দানপত্র লেখাইয়া আনিয়াছি। যদি তোমাকে আমি কখন ত্যাগ করি, তবে আমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।"

এবার আমার অকৃত্রিম অশ্রুজল পড়িল—তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন! আমি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, "আজি হইতে আমি তোমার চিরকালের দাসী হইলাম। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তাহার পরেই মনে২ বলিলাম, "এইবার সোণার চাঁদ, আর কোথায় যাইবে? তবে নাকি আমাকে গ্রহণ করিবে না?" যে অভিপ্রায়ে আমার এত জাল পাতা, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে।

আমার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন "ইন্দিরা"—মাতা নাম রাখিয়াছিলেন "কুমুদিনী।" শ্বশুরবাড়ীতে ইন্দিরা নামই জানিত, কিন্তু পিত্রালয়ে অনেকেই আমাকে কুমুদিনী বলিত। রামরাম দত্তের বাড়ীতে আমি কুমুদিনী নাম ভিন্ন ইন্দিরা নাম বলি নাই। ইঁহার কাছে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম প্রকাশ করি নাই। কুমুদিনী নামেই লেখা পড়া হইয়াছিল।

কিছু দিন আমরা কলিকাতায় সুখে সচ্ছন্দে রহিলাম। আমি এ পর্য্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একেবারে মহেশপুরে গিয়া পরিচয় দিব। ছলে কৌশলে স্বামীর নিকট হইতে মহেশপুরের সম্বাদ সকল জানিয়াছিলাম—সকলে কুশলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য বড় মন ব্যস্ত হইয়াছিল।

আমি স্বামীকে বলিলাম, "আমি একবার কালাদীঘি যাইয়া পিতামাতাকে দেখিয়া আসিব। আমাকে পাঠাইয়া দাও।"

স্বামী ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কি প্রকারে থাকিবেন? কিন্তু এদিকে

আমার আজ্ঞাকারী, "না" বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কালাদীঘি যাইতে আসিতে এখান হইতে পনের দিনের পথ ; এতদিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম, "আমিও তাই চাই। কিন্তু তুমি কালাদীঘি গিয়া কোথায় থাকিবে ?"

তিনি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কালাদীঘিতে কতদিন থাকিবে ?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে পাঁচ দিনের বেশী থাকিব না।"

তিনি বলিলেন, "সেই পাঁচ দিন আমি বাড়ীতে থাকিব। পাঁচ দিনের পর তোমাকে কালাদীঘি হইতে লইয়া আসিব।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে শিবিকারোহণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া গ্রামের মধ্য পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া নিজালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি পশ্চাৎ ফিরিলে, আমি বাহকদিগকে বলিলাম, "আমি আগে মহেশপুর যাইব—তার পর কালাদীঘি আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

তাহারা আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এ স্থানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

পর দিন পিতা আমার শ্বশুরবাড়ী লোক পাঠাইলেন। পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন, "জামাতা যদি বাড়ী না থাকেন, তবে যেখানে থাকেন, সেইখানে গিয়া এই পত্র দিয়া আসিবি।"

আমি মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি, তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরমাত্মীয়, আর সদ্বিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।" তিনি পত্র পাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক, এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শনলাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাঁহাকে আমি গ্রহণ করিব না।"

পিতা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কাদিগকে বলিলাম, "তোমরা উঁহাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন —তাহা হইলেই আমি উঁহাকে গ্রহণ করাইব।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "আমি যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।" শেষে মাতার রোদন এবং আমার সমবয়স্কাদিগের ব্যঙ্গের জালায় সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্য মনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে২ বলিলেন,

"হাঁ দেখ্, কামিনি, তুই আরও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?"

কামিনী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, "আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এ কি এ?"

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "চতুরচূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা— আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?"

তিনি অবাক্ হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, "এ আবার কোন্ রঙ্গ কুমুদিনি? তুমি এখানে কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোবরগণেশ, তাই এত দিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রামরাম দত্তের বাড়ী ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক —আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্মবিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এত দিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে তোমার স্ত্রীকে পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিনেই পরিচয় দিতাম।" দানপত্রখানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম, "সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, 'হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।' সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এইখানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমায় গ্রহণ কর; না অভিরুচি হয়, আমি তোমার উঠান ঝাঁটি দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দানপত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দানপত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড২ করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া—আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে চল।"

সমাপ্ত।